আমার স্মৃতিতে
ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক
আন্দোলনের পটভূমিকা

১৯০০-১৯৫২

বীরেন দত্ত



নবজাতক প্রকাশন

এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭



১ম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ১৯৮২

Bookfair 84, Agartala Rs. 5.00

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪, কলেজস্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
শ্রীপ্রতাপ রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

মূল্য : পাঁচ টাকা

ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের
বীর শহীদদের স্মৃতিতে

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপুরা বই মেলা উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার অন্যতম সদস্য হিসাবে ১৯৮১ সালে আগরতলা বই মেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি প্রথম ত্রিপুরা যাবার সুযোগ পাই। পরের বছর বই মেলায় যোগদান করার জন্য আবার আমাকে ত্রিপুরা যেতে হয়। সেই সময় ত্রিপুরার লেখকদের বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লেখকের কাছে আবেদন জানাই। এমন কি ত্রিপুরার কয়েকটি পত্রিকায় ত্রিপুরার লেখকদের লেখা প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করে বিজ্ঞাপন দিই। ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক শ্রীসমীবণ রায়ের সহযোগিতায় বর্ষীয়ান নেতা বীরেন দত্ত মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করি ও তাঁকে কয়েকটি বিষয়ে লেখার জন্য অনুরোধ জানাই, বীরেনদা আমাকে কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। গত ২৯শে আগস্ট কলিকাতায় ত্রিপুরা ভবনে বীরেনদা আমার হাতে এই বই-এর পাণ্ডুলিপি তুলে দেন। আমি স্বানন্দে তৎক্ষণাৎ বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করি। যদিও এই লেখাটি তাঁর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, আশা করি ভবিষ্যতে ত্রিপুরা প্রসঙ্গে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ বীরেনদার কাছ থেকে পাওয়া যাবে। ত্রিপুরা প্রসঙ্গে বীরেনদার লেখা বইটি প্রথম প্রকাশ করতে পেরে আমি ধন্য। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আজিজুল হক। রামকৃষ্ণ প্রেসের কর্মীবৃন্দ বইটি দ্রুত প্রকাশের কাজে সাহায্য করায় তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ বইটি পাঠ করে অনুপ্রাণিত হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মজহারুল ইসলাম

নবজাতক প্রকাশন

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

উপক্রমণিকা

ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী লেখার মূল প্রেরণাদাতা হলেন কিছু সংখ্যক উৎসুক অধ্যাপক এবং আমাদের যুব ছাত্র কর্মীদল। একে তীব্র করেছিলেন নবজাতক প্রকাশনের মজহারুল ইসলাম মহাশয়। তাঁদেরই তাগিদে অনেক ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত বর্তমান আকারে এই স্মৃতি নির্ভর পুস্তক লিখিত হল। এ বিষয়ে আমি অন্য সহকর্মীদের সাথেও আলোচনা করিনি। এর সঠিকতা অথবা ভুল ভ্রান্তির জন্য আমি নিজেই সর্বাংশে দায়ী। যে সব উদ্ধৃতি এই লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সকলেরই প্রতি আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা রইল। এক্ষেত্রে মণিময় দেববর্মার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথ্যের দিক থেকে বিশেষত রতনমণি সংক্রান্ত সরকারী দলিলপত্র তারই 'বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি' বই থেকে গৃহীত। প্রয়াত ত্রিপুর চন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ত্রিপুরা ইন্-ট্র্যানজিশন' বইটি আমার স্মৃতিকে জাগ্রত করিতে বিশেষ সহায়তা করেছে। এটি ইতিহাস বই নয়; এই স্মৃতিকথা থেকে যদি ইতিহাসের কোন উপাদান পাওয়া যায় তাহলে এই প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হবে তাই এর উপর আলোচনা, সমালোচনা, সংযোজন কামনা করছি। ত্রিপুরা ও তার বাইরে ক্ষুদ্র এই রাজ্যের আন্দোলনের অতীত সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এটি প্রকাশ করা হল।

বিনীত

বীরেন দত্ত

আগরতলা, ত্রিপুরা

২৭শে আগস্ট ১৯৮২

ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করতে গেলে বর্তমান শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনে পার্বত্য ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়েও কিছু জানা দরকার। বিভক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভূক্তিকরণের, বিশেষত ত্রিপুরার ভারতের অন্তর্ভূক্তি বিষয়েও কিছুটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এইদিক থেকে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশের জন্য কিছু তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। ভারত স্বাধীন হয় ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে। ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয় ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৯ সালে। ত্রিপুরাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি শাসন করতো না। এখানে একটি রাজবংশের শাসন রেখে দিয়েছিল। সামন্তরাজার শাসনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য সংলগ্ন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট জেলার প্রশাসনিক কাঠামো ছিল ভিন্ন ধরনের। এ বিষয়ে আমি পরবর্তী সময়ে আলোচনা করবো।

ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি জনগণ ছিল বিপুল সংখ্যাগুরু। একে বলা হত 'স্বাধীন' ত্রিপুরা। সংলগ্ন কুমিল্লা জেলার নাম ছিল 'ব্রিটিশ ত্রিপুরা' জেলা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যে পড়েছিল। "জেলে ত্রিশ বৎসর ও পাকভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" বইখানিতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) লিখেছেন,—"আগরতলার (ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী) অন্তর্গত উদয়পুর পাহাড়ে আমাদের একটা কৃষিফার্ম (গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র) ছিল, একটা পাশ করা দোনলা বন্দুক ছিল। আমি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া থাকিতাম।" (পৃষ্ঠা: ৭১-৭২) বেদুইনের "মহারাজের চোখে বাংলাদেশ" বইটির ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে "ত্রিপুরা ছিল করদ রাজ্য। পাহাড় আর বন। পাহাড আর বনে দেশীয় নৃপতির শাসন, শাসন ব্যবস্থায় যেমন ছিল কড়াকড়ি তেমনি ছিল শিথিলতা। বিশেষ করে জেলা ত্রিপুরা থেকে সহজগম্য পথে বিপ্লবীরা আশ্রয় করে নিতে পেরেছিল ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে। বড়ই ভাল মানুষ ওরা। পেটের দায়ে কেউ করেছে মুদিখানা, কেউ করেছে চাষের ক্ষেত—রাজার নজর নেই—রাজার পুলিশের সামর্থও ছিল না ওদের সাথে লড়াই করার।"

ত্রিপুরা রাজ্যের স্ট্যাটাস সম্পর্কে Atichsion এর Treaties-এ আছে : The British Government has no treaty with Tipperah. The Raja of Tipperah stands in a peculiar position in as much as in

addition to the hill territory known as 'Independent Tipperah', he is the holder of a considerable Zamindary in the District of Tipperah plains ; he receives his investiture from British Government required to pay the annual nazarana. Independent Tipperah is not held by gift from British Government or its predecessors or under any title derived from it on them, never having subjected by Moghal.

এই ত্রিপুরায় জন্মগ্রহণ করে কিছু ছাত্র যুবক বিংশ শতকের প্রথম দশকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববাংলার গভর্ণব স্যার মফিল্ড ফুলাব ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় এসেছিলেন। "ঐ সময় এই ছোট্ট শহরে দুইজন গৈরিক পোশাক পরিহিত যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল এবং কুমিল্লা শহরে তাদের বিচারের জন্য প্রেরণ করেছিল।" ("স্বাধীনতার সন্ধানে"—যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩২)। এ ছাড়াও রেগুলেশন ৩এতে ধৃত আকটবন্দী কয়েকজন মুক্তি পেয়ে ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। আমি এ-কথাগুলি উল্লেখ করছি এই জন্যে যে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমেদ তাঁর "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" বইখানিতে লিখেছেন,—"বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতিকে আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু তাঁদেরও বড অবদান আছে। তাদেরকে সেই অবদান ও তাঁদের বলিদানকে কে শ্রদ্ধা না করে পারেন ?" (পৃঃ ৯)

তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উপাদানসমূহ উপস্থাপিত করে গেছেন। আমরা সেই পার্টিতে প্রবেশ করে এই রাজ্যে ত্রিশেব দশকে পার্টি ও গণআন্দোলন পরিচালনা করতে উদ্যোগ লই। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমেদ এটাও উল্লেখ করেছেন,—"১৯২৯ এর দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে ধারণা পরিবর্তন শুরু হয়েছিল।...১৯৩০ এব দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাঁদের ভিতর হতে বহু সংখ্যক লোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।" আমরা যারা তৎকালীন দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরায় জন্মগ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম তাদের মধ্যে একটা অংশ উপরোক্ত কমিউনিস্টদের মধ্যে ছিলাম। বিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলি আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না বলে দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক সম্বন্ধেও কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। আমরা জন্ম থেকে জানতাম আমরা একটি 'স্বাধীন' রাজ্যের প্রজা। আর আমাদের রাজ্যের সীমানার বাইরে রয়েছে পরাধীন ভারত। একটু বড় হবার পর জানতে পারলাম যে এ রাজ্যের ভেতরে ঘাঁটি করে স্বাধীনতাকামী সন্ত্রাসবাদী নেতারা ইংরেজ অফিসারদের তাড়াবার জন্য বন্দুক চালনা শিক্ষা দেন এবং বোমা প্রস্তুত করেন। ইংরেজ অফিসারদের হত্যা করে দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা করেন। এটা আমাদের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল। আমাদের কয়েকজন যুবককে বস্তুতপক্ষে অতি অল্প বয়সেই সন্ত্রাসবাদী ভাবধারা ও সংগঠন প্রবল আকর্ষণ করেছিল। আমাদের যাঁরা পরিচালনা করতেন তাঁদের অনুশাসনগুলি আমরা বেদবাক্যের মত অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। এ-কথা তাঁরাও আমাদের বলতেন,—ব্রহ্মচর্য, শৃংখলা ও আত্মত্যাগের প্রমান দিলেই আমরা পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী দলের সভ্য হতে পারবো। পরবর্তী সময়ে আমরা অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়েছিলাম। যাঁরা আমাদের এ-পথে পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা কিন্তু ত্রিপুরায় রাজার শাসনের বিরুদ্ধে এতটুকু বক্তব্যও রাখতেন না। এ-ছিল তাঁদের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল।

তাদের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছিলাম তার মূল্যও খুব কম নয়—নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার এক অদ্ভূত উন্মাদনা; ভয়লেশহীন নিঃস্বার্থ জীবন দানের প্রবল আবেগ। শ্রেণীবিচারের শক্তি ছিল না। এটা হিজলী বন্দীশিবিরে একটু একটু করে পেতে শুরু করি। আজ অকপটে এ-কথা স্বীকার করবো যে কুমিল্লার কৃষক আন্দোলন ১৯৩১ সালে আমাকে নতুন ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে চিন্তিত করেছিল। কিন্তু কমিউনিজমকে গ্রহণ করা এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করার বিষয়ে যখনই আমি তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতাম তখনই বিশেষ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যেতাম। আমি তখন কলেজের ছাত্র এবং অনুশীলন সমিতির অধীনে দল গঠন, ছাত্র আন্দোলন ও স্বদেশী ডাকাতিতে লিপ্ত হয়েছিলাম। সন্ত্রাসবাদী নেতৃবৃন্দ এটাই আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাড়াবার জন্য জাতিগত একতা বড় প্রয়োজন। শ্রেণী বিভেদ ও শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ আমি সেই কথাই বিশ্বাস করতাম। পক্ষান্তরে বিশাল

জনজমায়েতকারী ইয়াকুব মিঞা, ইদ্রিশ মিঞা, ফনী মজুমদার প্রভৃতি ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েও কোন পরিষ্কার ধারণা পেতে পারিনি। রাজবন্দী হিসাবে হিজলী ক্যাম্পে. আর-এস্-পি-পন্থী সমাজতন্ত্রী গ্রুপের সঙ্গে প্রথমে মিলিত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন দেখতে লাগলাম চট্টগ্রামের বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশ একটা বড় অংশ জেলখানায় কমিউনিস্ট কনসোলিডেশনে যোগ দিচ্ছেন, তখন আমি আর-এস্-পি-পন্থী হয়ে যাওয়া অনুশীলন সমিতির নেতাদের প্রভাবমুক্ত হই। এটা উল্লেখ করছি এই জন্যে যে প্রকৃতই তত্ত্বগত সার্বিক মূল্যায়ণের বিচারে বই পুস্তকের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ারচেতনা তখনও জাগেনি। পরবর্তী সময়ে যখন কমিউনিস্ট সাহিত্য পড়াশুনা নিয়মিত আরম্ভ করেছিলাম এবং নিজের কাজকর্ম কোথায় হবে তা ভাবতে শুরু করেছিলাম তখন সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম এঙ্গেল্‌সের লেখা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইখানার দ্বারা। এই বইখানা আমার জন্মস্থান উপজাতি প্রধান ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা দিতে সাহায্য করেছিল। আমি মুক্তি পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে ত্রিপুরায় কাজ করবো এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ধারা, শ্রেণী সম্পর্ক, উপজাতী ভাষা সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করবো—এইসব ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমি বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষাভাষী বলে আমার মনে উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে প্রথম জীবনে যে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, জেলে যাবার পূর্বে তা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়েছিলাম। এর কারণ ছিল। উপজাতি মধ্যবিত্ত অংশ থেকে কয়েকজন সহকর্মী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন ও কিছু সংখ্যক রাজবন্দীও ছিলেন। মুক্তি পেয়ে কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। কিছু সংখ্যক আর-এস্-পি-পন্থী হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন দ্বিভাষী ; বাংলা ভাল বলতে ও লিখতে পারতেন, আবার ককবরক ভাষায়ও তাদের দখল ছিল। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এর মধ্যে প্রয়াত প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর অন্যতম। বংশী ঠাকুর কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না। তিনি প্রভাত রায়ের মাধ্যমে আমাদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর চরিত্রে একটা ভবঘুরে আবেগ ছিল। তিনি পদব্রজে প্রায় সারা ভারত ঘুরেছিলেন। তিনি দারোগার চাকরি ছেড়ে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি ত্রিপুরা বোর্ডিং-এর পরিদর্শকের কাজ করতেন।

ত্রিশের দশকের সেই দিনগুলিতে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত হবার জন্য রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে যখন পরিভ্রমণ করি তখন রাজ্যের শাসন কাঠামো সম্পর্কে এঙ্গেলসের লিখিত তথ্যগুলির প্রমাণ জীবন্তভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। ব্রিটিশ ভারতের কোর্ট, কাছারী পুলিসী ব্যবস্থা, জেলখানা প্রভৃতি সংস্থার কার্যকলাপের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা বিশেষ পার্থক্য অনুভব করেছিলাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এইরূপ রাজ্যগুলির শাসন কর্তৃত্ব রাজাদের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন। রাজারাই ছিলেন আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাব উৎস। আজকের দিনের মত আইন আদালত সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যেমন চলে সামন্ত রাজতন্ত্রে সেরূপ ছিল না। অনুন্নত উপজাতিব পার্বত্য জীবনধারাব সাথে সংগতি রেখে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল।

১৯২৩ সালের ১৪ই আগস্ট মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু-দিবসের স্মৃতি আজও আমার অন্তরে জাগরুক আছে। একটা অদ্ভূত করুণ সুরে ব্যাণ্ডবাদ্যের মধ্য দিয়ে শোকযাত্রা শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আগরতলা শহরে তখন পাঁচ সহস্রাধিক লোকের বাস। প্রায় সবাই শবানুগমন করেছিল। নাবালক মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর চার বৎসর সিংহাসনে আরোহন করতে পারেন নি। সাবালক হবার পর কাউন্সিলের শাসন অবসান হয় এবং ১৯২৭ সালে তিনি ত্রিপুবার রাজসিংহাসন ও চাকলা রোশনাবাদের জমিদার হিসাবে অভিষিক্ত হন। এই অভিষেকের জাঁকজমক যারা দেখেছেন তাবা আজও ভুলতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হযেছিল। অমরা ইতোমধ্যে সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সংস্পর্শে এসে গিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হল রুশ বিপ্লবের কথা তাদের কাছ থেকে শুনতে পাইনি। অথচ মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, ডি. ভেলেবাব কথা শুনেছিলাম, দেশের ক্ষুদিরাম, কানাইলালের কথা শুনেছিলাম, এদিকে ১৯২০ সালে নভেম্বর বিপ্লবের দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রচার করা হয়েছিল। ১৯২৭ সালের ত্রিপুরায় রাজনৈতিক চেতনার স্তরের কথা আজ ভাবতে বিস্ময় জাগে। ১৯২৭-২৯ সালে উমাকান্ত একাডেমীতে পাঠরত অবস্থায় আমি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছিলাম। ব্যায়াম, ছোরা চালানো ইত্যাদির শিক্ষা আমাদের বাড়ীতেই দেওয়া হত। আমার অগ্রজ বীরেন দত্ত, অনুজ জিতু দত্ত এবং আমি সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়ে

যাচ্ছিলাম। এসব বিষয়ে আমার পিতা যজ্ঞেশ্বর দত্ত সবই জানতেন। কিন্তু তিনি আমাদের বাধা দিতেন না। তিনিও স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে গৌরবজনক বলে মনে করতেন। অশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মুখে ও নভেম্বর বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম বলে মনে পড়ে না।

তখন ত্রিপুরার বাইরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, কংগ্রেসী গণআন্দোলন, বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছিল। ১৯২৯ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা বনাম ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বিতর্ক প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। আমি কংগ্রেস মণ্ডপে সুসজ্জিত ভলান্টিয়ার বাহিনী দেখে কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি। কারণ আমাদের সন্ত্রাসবাদী নেতাদের মুখে সর্বদা শুনে এই ধারণা হয়েছিল যে কংগ্রেস একটি নিবীর্য আপোষকামী সংস্থা। ঐ সময় আমার বয়স খুব বেশী নয়। ঘোড়ার পিঠে স্বেচ্ছাসেবক নেতাদের সৈনিক বেশে দেখে স্বাধীনতা যোদ্ধারূপে মনে ছাপ ফেলেছিল। এই কংগ্রেস অধিবেশন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে কমিউনিস্টদের (তখন ছিল পেজেণ্টস্ এণ্ড ওয়ার্কাস পার্টি) নেতৃত্বে এক বিরাট শ্রমিকমোর্চা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছিল। কংগ্রেস নেতা, কর্মী ও ভলান্টিয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে আমি তখনও শ্রমিকমোর্চা বিরোধী মনোভাব পোষণ করতাম। এইসব ঘাত প্রতিঘাতে আমার চিন্তা দোদুলামান ছিল। গণআন্দোলনে বিভিন্ন ধরণের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এবং গণআন্দোলনের ওপর একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস জাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী পার্টির শৃঙ্খলা, প্রভাব এবং প্রচার রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক ডাকাতি, ব্যক্তিহত্যা প্রভৃতিতে মনকে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তখনও অনুশীলন সমিতির বাইরে আসতে পারিনি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় গোপন সংযোগ রক্ষাকারীর দুরূহ ভূমিকা আমাকে পালন করতে হয়েছিল। কুমিল্লা ও আগরতলার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের যে উদ্যোগ চলেছিল তার সংযোগ রক্ষাকারীর গোপন ভূমিকা আমাকে পালন করতে হয়েছিল।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বেই দেশে যে ব্যাপক গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল তাকে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি, বরং এ সময়ে কুমিল্লাতে কংগ্রেসের ভেতরে থেকে যে অংশ কৃষক আন্দোলন করতেন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলাম। কংগ্রেসের অফিসে আমার

যাতায়াত ছিল নিয়মিত। এর ফলে অনুশীলন সমিতির একটা অংশ, আমার ছোট ভাই জিতু দত্ত, অনন্তলাল দে, সুকুমার ভৌমিক প্রভৃতি আগরতলার সভ্যরা এবং কুমিল্লার হরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পবিত্র পাল প্রভৃতি সভ্যরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তারা আমাকে কংগ্রেসী বা বামপন্থী কংগ্রেসী বনে যাওয়া সম্পর্কে সাবধান করতেন। ফলে আগরতলায় যখন প্রথম স্বদেশী ডাকাতি হয়েছিল, তখন লক্ষ্য করেছিলাম এই ডাকাতিতে ধৃত পবিত্র পাল আমার সহপাঠি হয়েও আমাকে এই ঘটনা সম্পর্কে এতটুকু জানতে দেননি। এই ডাকাতিতে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শচীন দত্ত, পবিত্র পাল প্রভৃতি ধৃত হন। কৃষ্ণ চক্রবর্তী কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর বড ভাই। ঠিক একই সময়ে ১৯৩১-৩২ সালে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অনেকগুলো সংঘর্ষ ঘটেছিল। হাসানাবাদের এক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের গুলি চালনায় চারজন নিহত হন। তখন আমি দুটি কাজে একসঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আগরতলায় ডাকাতির মামলা পরিচালনার জন্য কামিনী দত্ত ও নরেন্দ্র বলকে কুমিল্লা থেকে উকিল নিযুক্ত করেছিলাম। আগরতলায় আমার পিতা যজ্ঞেশ্বর দত্ত এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন। অপরদিকে কুমিল্লার কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ থাকার ফলে অনেক আত্মগোপনকারী কৃষক নেতাকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। এই সময়ে আমার জীবনে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রশ্ন প্রবলভাবে উত্থিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী পথই আঁকড়ে থাকবো অথবা গণআন্দোলনের মাধ্যমে অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সামিল হব। এর মধ্যে একটি পথ যে আমাকে বেছে নিতে হবে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম। যোগাযোগের দিক থেকেও একটা আশ্চর্য সুযোগ এসেছিল। আগরতলা ডাকাতির মামলা পরিচালনার জন্য কামিনী দত্ত উকিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলাম। আর জেল থেকে এসে কামিনী দত্তেরই পৌরহিত্যে কুমিল্লায় কিষান সম্মেলনের পরে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম জনসভায় আগরতলাতে তাঁকেই প্রধান বক্তা হিসাবে পেয়েছিলাম। কমরেড মহম্মদ আব্দুল্লা রসুল তাঁর History of All India Kisan Sabha বইয়ের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখেছে,—১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দা সমগ্র পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়াকে গ্রাস করতে থাকে। ভারতবর্ষ এর ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল

না। সবচেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত ভারতীয় জনগণের মধ্যে ছিল ভারতের কৃষকসমাজ। কৃষিপণ্যের বাজার দাম নেমে গিয়েছিল কিন্তু খাজনা, ট্যাক্স, মহাজনী সুদ এতটুকু কমে নাই। বিরাট সংখ্যক কৃষক জমিজমা বিক্রী করে দিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়। গ্রাম্য কারিগরেরা বাজার হারিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত লাখ লাখ মানুষের সারিতে এসে দাঁড়ায়। সর্বনাশা অন্ধকার গ্রামীন শ্রমিকদের চোখে ভীতির সঞ্চার করে। গ্রাম্য ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ত্রিশের দশকের প্রথম থেকে দারিদ্রের ঘন অন্ধকার, বেকারী ও ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার চরম দারিদ্র, বুভুক্ষার চরম নৈরাশ্যজনক' আবহাওয়া তৈরী করে। এই স্তবে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকদের রিলিফ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটা ঘটে জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০ থেকে ৩৪ সনে) সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ফলে। কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপর মনুষের বিশ্বাস কমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বামপন্থীদের কাছে প্রশ্নটা রিলিফের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। তারা কমবেশী গ্রামাঞ্চলে ভূমি সম্পর্কের পরিবর্তনের আন্দোলন লক্ষ্য করে উদ্দীপনাও লাভ করেছিলেন। শুধুমাত্র পরিস্থিতি অনেক কৃষক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছিল।"

বাইরের জগতে যখন এই আলোড়ন চলেছিল তখনও আমাদের মতো বামপন্থি জাতীয়তাবাদীদের অন্তরে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আমরা কৃষক আন্দোলনগুলির জঙ্গীভাবটিকে সন্ত্রাসবাদী চেতনার সাথে মিলিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। এই সময়ে (১৯৩১-৩২ সালে) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার মতো ঘটনা ঘটেছিল। তখন আমি যে বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকতা করে কুমিল্লা কলেজে পড়তাম তার মালিকের নাম ছিল ডাক্তার বঙ্গবিহারী দে। তিনি ছিলেন একজন অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন। তাঁর একটি ওয়েভলি পাঁচঘরার লাইসেন্স করা পিস্তল ছিল। এটি তাঁর মেয়ের সহযোগে অনুশীলন সমিতি সরিয়ে নিয়েছিল। পিস্তলটির লাইসেন্স রিনিউ করতে গিয়ে মালিক খোয়া যাওয়ার ঘটনা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অবশ্য কারো নাম না দিয়ে এই খোয়া যাওয়ার ঘটনা পুলিশকে জানিয়েছিলেন। যে মেয়েটি এই কাজে সহায়তা করেছিলেন তিনি আমাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি আত্মগোপন করে অনুশীলন সমিতির সংগঠনের মধ্যে থেকেই কুমিল্লা জেলায় বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কাজ করতাম। পত্রিকাতে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা কমরেড

গোপেন চক্রবর্তীকে চাঁদপুর মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনার এক আয়োজন করেছিলেন। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সভাশেষে এক বাড়ীতে তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্যদের একটা বৈঠক অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই বৈঠকে মূলত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বক্তব্যগুলি উপস্থিত করেছিলেন এবং আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম তাদের নিকট কমিউনিস্ট পার্টির পুস্তকাদি লাভের সূত্রের কিছু সন্ধান দিয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের শেষভাগে (১০-৮-৩৩) বি, সি, এল, এ-তে আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম এবং ১৮-৮-৩৮ সালে মুক্তি পেয়েছিলাম। বিভিন্ন জেলা এবং গ্রামে অন্তরীন থাকা অবস্থায় আমি কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলাম· তখনই সংকল্প করেছিলাম যে আগরতলায় ফিরে এসে শ্রেণী ও গণআন্দোলন গঠন করার কাজে আত্মনিয়োগ করব। সালার গ্রামে অন্তরীন থাকার সময়ে আমি হিজলী, বহরমপুর, বক্সা আন্দামান ইত্যাদি জেল ও ডিটেন্‌সন্ ক্যাম্প থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আগরতলার রাজবন্দী ও সাজাপ্রাপ্ত মুক্ত বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। আশান্বিত হয়েছিলাম যে তারাও অনেকে আমার মতো কমিউনিস্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং অনেকে জেলে কমিউনিস্ট কন্‌সোলিডেশনের সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১১ই থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত কুমিল্লায় যে সর্বভারতীয় কিসান সম্মেলন হয়েছিল তাতে আগরতলা থেকে একটি ভাল ডেলিগেশন পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ঐ ডেলিগেশনে অনন্তলাল দে, জিতু দত্ত, স্নেহাংশু বিকাশ চৌধুরী, বঙ্কিম চক্রবর্তী, নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত, ঊষা রঞ্জন দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা প্রভৃতি যোগদান করেছিলেন। আমি আগস্ট মাসে মুক্তি পেয়ে আগরতলায় এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। সকলের পরামর্শক্রমে ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি গঠণের প্রাথমিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করেছিলাম। এই সমিতির মূল দাবী ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাজানুগত্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করা। এ ছাড়াও অর্থনীতিক দাবীগুলির মধ্যে ছিল কৃষক সমিতিতে গৃহীত খাজনা মকুব, মহাজনা ঋণ মকুব, কৃষকদের জীবন ও জীবিকা উন্নত করার অনুকূলে আরও যেসব প্রস্তাব কুমিল্লা কিসান সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল তার অনেকগুলি জনমঙ্গল সমিতির প্রথম সভায় গ্রহণ করানো গিয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে হিজলী ক্যাম্পে সুরেন ঘোষ এবং মানবেন্দ্র নাথ রায়-পন্থীদের সাথে শচীন্দ্রলাল সিংহ যোগাযোগ রাখতেন। জনমঙ্গল সমিতির পক্ষ

থেকে তাঁকেও এই সমিতিতে যোগ দেবার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যোগদান করেন নি। তিনি কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকলেন। পরবর্তী সময়ে আমরা যখন প্রজামণ্ডল গঠন করি তখন তিনি বামপন্থীদের সাথে মিলিত হয়ে গণপরিষদ নামে একটি সংগঠন গ'ড়ে তোলেন। এই সময় এম. এন. রায় আনন্দ-বাজার পত্রিকাতে জনমঙ্গল সমিতিকে মহারাজার সৃষ্ট সুবিধাবাদী সংগঠণ হিসাবে চিহ্নিত করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এর প্রতিবাদে কমরেড ধরণী গোস্বামী ঐ আনন্দবাজারেই জনমঙ্গল সমিতি সম্পর্কে আর একটি পাল্টা প্রবন্ধ লেখেন।

এইসব ঘটনার সময়েও কুমিল্লায় স্বীকৃত কোনো কমিউনিস্ট ইউনিট গড়ে ওঠে নি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির নেতৃত্বে জেল থেকে প্রত্যাগত এবং কৃষক সংগ্রামের মধ্য থেকে এগিয়ে আসা কর্মীদের বাছাই করে একটি প্রকৃত পার্টি ইউনিট গঠন করার উদ্যোগ নেন। কারণ কিছু সংখ্যক স্বদেশী নেতা স্বঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অথবা সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অনুমোদন ছাড়াই কাজ চালাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ত্রিপুরায় আমরা যারা কমিউনিষ্ট পার্টির ইউনিট হিসাবে আলোচনাক্রমে গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নই আমাদের প্রতিও বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টির সজাগ দৃষ্টি ছিল। সম্ভবত এরজন্যই কমরেড ধরণী গোস্বামীকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ কাজকর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বনের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ আর. এস. পি-পন্থী সুকুমার ভৌমিক, প্রভাত রায় প্রভৃতিরা জনমঙ্গল সমিতিতে কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন নির্দলীয় গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। সম্পাদক আর. এস. পির প্রভাত রায়। আমি কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলাম। যুক্ত বাংলায় আর. এস. পি-পন্থীরা কমিউনিস্ট সংগঠণের তীব্র বিরোধীতা করতেন। এ'ছাড়াও জেলে না যাওয়া অনুশীলন সমিতির সমর্থকও এই সমিতির কার্যকরী কমিটিতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আজও জীবিত আছেন। জনমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যবিত্ত অংশ যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন—তাদের অনেকেই এই সমিতিতে এসে-ছিলেন। এ'ছাড়াও মনিপুরী ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত স্বল্প শিক্ষিত গ্রামের কৃষকও এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বাঙালী, মনিপুরী অংশের উপর হাসনাবাদ-বরুড়া-গালিমপুরের আন্দোলন আর সুরমা ভ্যালীর করুণাসিন্ধু রায়ের নেতৃত্বে

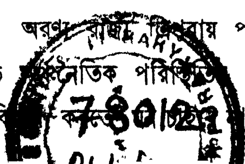
চালিত মণিপুরী ও মুসলমান কৃষক সমাজের ব্যাপক আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ তাদের আত্মীয় স্বজনকে প্রভাবিত করেছিল। কুমিল্লার কিসান কনফারেন্সে যেখানে সমগ্র যুক্তবাংলা থেকে ৩৪,০০০ কৃষক সদস্যের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, সেখানে একমাত্র সুরমা ভ্যালীর ২৫,০০০ সদস্যের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। আমি এখানে কুমিল্লার কিসান কন্‌ফারেন্সের তথ্য উল্লেখ করছি। এই সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে মোট ৫, ৪৬, ৮০০ কৃষক সদস্যের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন বিহারের ২, ৫০, ০০০ পাঞ্জাবের ৭০,০০০, অন্ধ্রের ৫৩,০০০, উড়িষ্যার ১৮,০০০, উত্তর প্রদেশের ৬০,০০০, মধ্যপ্রদেশের (গুজরাট ও মহারাষ্ট্রসহ) অবশিষ্ট অংশ। [কৃষক সভার ইতিহাস—মহম্মদ আবদুল্লা রসুল ; পৃঃ ২২]

এছাড়া ১৯৩১ সালে রাণী গইদুলুর নেতৃত্বে নাগা পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। মণিপুরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এবং কৃষক প্রজা সংগ্রাম থেকে থেকে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত পরিবেশের মধ্যে পাঁচ লক্ষাধিক মুলত উপজাতি প্রধান জনসমষ্টি অধ্যুষিত ক্ষুদ্র ত্রিপুরায় জনমঙ্গল সমিতির আন্দোলন এক বিশেষ চেতনার সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দশরথ দেববর্মা প্রয়াত কমরেড হেমন্ত দেববর্মার স্মরণে লেখাটিতে উল্লেখ করেছেন,—"সামন্ত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাবধারা রাজভক্ত উপজাতি সমাজে সঞ্চালিত করেন কমিউনিস্টরাই; তাঁরাই প্রগতিশীল আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। তখন ত্রিপুরার উপজাতিদের চোখে রাজারা ছিলেন ভগবানের প্রেরিত প্রতিনিধি এবং উপজাতিদের দেবতা স্বরূপ। সেই রাজতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অন্যান্য প্রগতিশীল দলসমূহ। তখন ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের সংখ্যা হাতেব আঙ্গুলে গণনা করা গেলেও সেই কমউনিস্টরাই ছিলেন তখনকার দিনের সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং বৃহত্তম গণআন্দোলনের প্রবর্তক।"

"১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে আগরতলা ও তার আসে পাশে আমি তখন প্রথম জনমঙ্গল সমিতির জনসভাগুলি দেখি। কোন সালে এই জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়েছিল তা আমার জানা নাই। জনমঙ্গল সমিতির সভা-সমিতির পুরোভাগে আমরা যাদের দেখতাম কমরেড বীরেন দত্ত, প্রভাত রায়,

গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বংশী ঠাকুর এবং চৌধুরী পাড়ার চামু কবরা (হেমন্ত দেববর্মার জ্যেঠা), জিরানীয়ার সুকুমার দেববর্মা (সুকুমার সর্দার নামে পরিচিত) কমরেড বীরেন দত্ত এবং পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ব্যতীত সকলেই এখন প্রয়াত।' [ইয়াপ্রী, হেমন্ত স্মরণ সংখ্যা]

১৯৩৮-৩৯ সাল ব্যাপী এই জনমঙ্গলের আন্দোলন অতি দ্রুত গ্রাম ও শহরের জাতি উপজাতি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছিল ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী ও অ-উপজাতি জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবাট বৈষম্যের বিষয়টি। শুধু কৃষক বললেই ত্রিপুরার কৃষকদের বোঝা যেত না। উপজাতিয়গণের মধ্যে জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষা ও সম্পদের দিক থেকে তাঁদের অবস্থা ছিল খুবই পশ্চাদপদ। তাঁবা ছিলেন লেখ্য ভাষাহীন। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমতুল্য; অর্থনীতির অবস্থা একই প্রকার ছিল। ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে আবার রিয়ারিং সম্প্রদায় ছিল প্রায় সম্পূর্ণ জুম-নির্ভর। রিয়াং জমাতিয়া ও ত্রিপুরীদের মধ্যে পূর্বেও রাজ-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। সে সব বিবরণ ব্রিটিশের পলিটিক্যাল এজেন্টের সংগৃহীত তথ্যে পাওয়া যায়। জমাতিয়া ও ত্রিপুরীদের মধ্যে হালচাষী কৃষক সৃষ্টি হয়েছিল। কুকি এবং লুসাই সম্প্রদায় ভাষাগতভাবে ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। জমাতিয়া, ত্রিপুরী ও রিয়াংরা ককবরক ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। এই পার্বত্য উপজাতিরা মনিপুরীদের বলত মুগলিসা, বাঙালী হিন্দুদের বলত ওয়ান ছা, বাঙালী মুসলমানদের বলত তুরুক ছা। ত্রিপুরার কৃষক আন্দোলনের সমস্যা ছিল অতি জটিল। সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের হাতে। আগরতলার বুকে সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর ছিল হাজী রহিম বক্স ও মণ্ডলা বক্স ব্রাদার্সের। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হাটগুলিতে পেশাভিত্তিক বাঙালী ব্যবসায়ীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। প্রশাসন ছিল মূলত বাঙালী অফিসার দিয়ে গঠিত। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকেই গোড়া থেকে শোষক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস উপজাতি জাতিয়তাবাদীদের ছিল। ঠিক এই অবস্থাটি সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বর্তমান ছিল। অরণ্য রাজ্য ত্রিপুরায় পথঘাট ও যানবাহনের অপ্রতুলতা এবং সম্পূর্ণ অনুন্নত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তৎকালীন চিত্র এখন বর্ণনা করলে অনেকেরই তা' বি[illegible] ক[illegible]। অথচ বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের



শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ত্রিপুরার প্রজাদের মধ্যে শুধুমাত্র দেশভক্ত সন্ত্রাসবাদীদের আকৃষ্ট করেছিল এমন নয়, পার্বত্য ও সমতলের উপজাতি এবং বাংলা ভাষাভাষী কৃষকগণের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এখানে একটি বড় ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ১৯২১ সালে চাঁদপুরে আসামের হাজার হাজার ধর্মঘটী চা শ্রমিকদের উপর নির্যাতন হয়েছিল। তখন ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে ওদের অনেকে প্রবেশ করেছিল। আগরতলা, কৈলাসহর প্রভৃতি অঞ্চল এর ফলে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি মহারাজার বন্ধুত্বসুলভ আচরণের প্রতিবাদে আগরতলা সরবরাহ লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন করতে গিয়ে আমরা জানতে পেরেছিলাম সেই আন্দোলনের সময়ই তাঁরা অনেকে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন। এসব ঘটনার ফলে ১৯২৭-২৯ সালের মধ্যে মহারাজার শাসন ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র রাজধানীর রাজপ্রাসাদে ও ব্রিটিশ ধরণের আদালত কোর্ট কাছারীর উপর নির্ভরশীল না রেখে একটা শাসন সংস্কার গৃহীত হয়েছিল।

শহরের আদালতে হালচাষী কৃষকদের মধ্যে উপজাতি ছাড়া অন্যান্যদের যে ফৌজদারী দেওয়ানী মামলা হত তা ব্রিটিশের অনুরূপ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হত। জমিজমা সংক্রান্ত স্বত্বের মামলায়ও উভয় সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি এসব আদালতে আসতেন কিন্তু উপজাতি জনগণের সামাজিক রীতিনীতি অনুযায়ী কোন বিচার ব্যবস্থা লিখিত আকারে ধারাবাহিক সম্পন্ন করার বিধান ছিলনা। ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মানব অধিকার লংঘনকারী অনেকগুলি বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের স্তরে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা রাজাদের কিছু কিছু লিখিত বিধান চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই স্তরে ত্রিপুরায় যে শাসন সংস্কার হয়েছিল তার নাম ছিল 'ত্রিপুরা ক্ষাত্রমণ্ডলী গঠন।' কাউন্সিল প্রশাসনের পর ১৯২৭ সালের ১৯শে আগস্ট মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর চাকলা রোশনাবাদের জমিদার ও ত্রিপুরা রাজ্যের অধীশ্বর হন। ত্রিশের দশকে আন্দোলনের ইতিহাস ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করেছিল। এ সময়ে ত্রিপুরাতেও অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর পলিটিক্যাল এজেন্টের পরামর্শক্রমে ত্রিপুরা ক্ষাত্রমণ্ডলী গঠন করে উপজাতি কৃষকদের আন্দোলনের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ত্রিপুরা ক্ষাত্রমণ্ডলীর অপর নাম ছিল পাহাড়ী আদালত। রাজ-

প্রাসাদের নীচের তলায় এই আদালতের অধিবেশন বসত। দশ জন সদস্য নিয়ে দ্বিতীয় আপীল কোর্টের কাজ করত। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মহারাজা স্বয়ং। এই দশ জনের কমিটির নীচে পনের জন করে সদস্য নিয়ে আরো দুটি কমিটি গঠিত হত। উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় উপজাতিদের মধ্য থেকে অতি বিশ্বস্ত সর্দারদের নিয়ে এই কমিটিগুলি গঠিত হত। তাদের কাজ ছিল প্রথম আপীল আদলতের মতো। গ্রামগুলিতে বিচার হতো এই দশজন কর্তৃক মনোনীত গ্রাম বা পাড়া সর্দারদের দ্বারা। যদি কোন সর্দার প্রয়োজন মনে করতো তবে কোন মামলা পনের সদস্যযুক্ত প্রথম আদালতে নিয়ে আসতে পারতো সেখানেও বিচারের সুমিমাংসা না হলে দ্বিতীয় আপীল আদালতের কাছে বিষয়টি পাঠাতে পারত। সাধারণত এই দ্বিতীয় আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। কেবল মহারাজা এই রায় পরিবর্তন করতে ক্ষমতাশীল ছিলেন। দ্বিতীয় আপীল আদালতের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন রেবতী মোহন দেববর্মা। এই বিচার আদালতের নথীপত্র থেকে দেখা যায় নারী সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলাই বেশী হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫ সদস্যের প্রাথমিক আদালতটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতো। আদালত আসামীদের তৎকালীন অর্থমূল্যের হারে ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড করতে পারতো। অনাদায়ে আলং নামে বন্দীশিবিরে আটক রাখতে পারতো। দেখা যায় অপরাধীরা নিজ অপরাধ স্বীকার করত। জরিমানার টাকার একাংশ বাদীকে দেওয়া হত। এবং কিছুটা রাজার নিজ তহবিলে রাখা হত। এই টাকা রাখার জন্য নিজ তহবিলে ছাপার বিধি পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য এবং ব্যয় করার বিধানগুলো রাজার আদেশে আইন বলে স্বীকৃতি পেত। প্রথম দিকে এর ফলে পার্বত্য এলাকায় বিচার ব্যবস্থা খুব সহজ হয়ে পড়েছিল। বৃন্দা নামে আলং জেলায় কিছু সান্ত্রী পুলিশ হিসাবে কাজ করত এবং আদালতের আদেশ তারাই জারী করত।

একদিনের মধ্যে সমস্ত বিচার সম্পন্ন হয়ে যেত। কোন উকীল, মোহরার কোর্ট ফির দরকার হতো না। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩২ সালে বিধিবদ্ধভাবে চালু হয়েছিল এবং ১৯৪৯ সালে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চালু ছিল। কিন্তু গণআন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মনোনয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। সেই সময় মহারাজা ধীরে ধীরে এর কার্যকারীতা কমিয়ে আনার জন্য এবং উপজাতি সমাজের ক্ষমতাচ্যুত মনোভাবকে ভিন্ন পথে

প্রবাহিত করার জন্য ১৯৩৩ সালে সর্দারগণকে দিয়ে ত্রিপুরা বোর্ডিং নামে দুটি বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দক্ষিণ এবং উত্তর ত্রিপুরার অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ছেলেদের কম খরচে বোর্ডিংএ থেকে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং এদের তদারকীর ভার ঐ সর্দারদের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। এভাবে উপজাতি যুবকদের কিছু সংখ্যককে শিক্ষিত করে এবং রাজপরিবারের ও ঠাকুর সম্প্রদায়ের একটি অংশ নিয়ে ত্রিপুরা প্রশাসনের চাকুরীতে নিয়োগের পরিকল্পনাও করেছিলেন। তখন বাইরে থেকে কর্মচারী নিযোগের বিরুদ্ধে মনোভাব আমরা দেখেছিলাম। উপজাতিদের জাতি হিসাবে বিকাশের প্রশ্ন তখনকার দিনে উত্থিত হয়েছিল। কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকার ফলে এই প্রশ্নের সঠিক মিমাংসার পথ খুঁজে পেতে পারেন নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন আইন ত্রিপুরার মধ্যেও ভোটে নির্বাচিত সরকাব গঠনের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। সৌভাগ্যবসত এই সময়েই ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনমঙ্গল সমিতি জন্মলাভ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে জনশিক্ষা আন্দোলন, প্রজামণ্ডল আন্দোলন এবং গণমুক্তি পরিষদে আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। ত্রিপুরায় তখন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন গণআন্দোলন নির্যাতিত জাতিগত, শ্রেণীগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জন জমায়েতের প্রক্রিয়া সাফল্যজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। তাই ত্রিপুরার মহারাজা ১৯৪১ সালের ত্রিপুরা সংবিধান (নং-১) ত্রিপুরাব জনগণের উপব চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই আইনে বাঙালীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য চিফ্ জাষ্টিস কে. সি নাগকে মনোনীত করা হয়েছিল। উপজাতীদের মধ্যে ললিত মোহন দেববর্মাকে এবং মুসলিম জনগণের পক্ষে তমিজউদ্দীন খানকে মনোনীত করা হয়েছিল। ত্রিপুবাব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব একে প্রতিরোধ ও বর্জন করার আহ্বান দিয়েছিলেন। পরিস্থিতির এই বৈশিষ্ট্যের সাথে আরো সংযুক্ত হয়েছিলো আমাদের এই ছোট পার্টি গ্রুপটির উপর জাতি, উপজাতি সমস্যা অনুধাবন কবা এবং এই সমস্যাব উপর দৃষ্টি রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদবিরোধী শ্রেণী ও গণফ্রন্ট গডে তোলার দায়িত্ব। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিভিন্ন আন্দোলনগুলিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ব। উপজাতিদের মধ্যে আর সামাজিক আচাব বিচার বড কথা ছিল না। তাঁরা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি কি রাজ দরবারে, কি

প্রশাসনে, অথবা গণআন্দোলনের নেতৃত্বের কাছেও তেমনভাবে সমাদৃত হচ্ছিল না। উপজাতি দেশভক্ত কৃষকের সন্তানগণ ও শহরের মধ্যবিত্ত বঙ্গসংস্কৃতি বহনকারী উপজাতি সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। শহরের উপজাতি নেতৃবৃন্দ বাঙালীদের মতো আন্দোলনে সংযুক্ত হয়েও গ্রামের ককবরক ভাষাভাষীদের অনেক কিছু সংস্কৃতিকে পশ্চাদপদতার লক্ষণ হিসেবে দেখেছিলেন। শহরেব ঠাকুর সম্প্রদায় মূলত ককবরক ভাষা ভুলেই গিয়েছিলেন। গ্রামেব ছাত্র সমাজ কিন্তু নিজেদের অনেকগুলি ঐতিহ্যকে দেশ-প্রেমের অন্তঃভুক্ত বলে মনে কবতেন। ভাষাব উন্নতি এবং উপজাতি থেকে জাতীয় স্তরে বিকাশেব স্বপ্ন দেখতেন। অথচ তাঁদেব স্বজাতি বাজা ও রাজ শাসন এটাকে আমলই দিত না। জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হওযার পর শহব এবং গ্রামের উপজাতি প্রগতিকামীরা ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিতর্ক থাকা সত্বেও একই সমিতির পতাকাতলে সমবেত হচ্ছিলেন। বাঙালী হিন্দু, মুসলমান প্রগতিকামী অংশের সঙ্গে মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজ-শাসনের বিরুদ্ধে এবং প্রজার ভোটে সবকারেব দাবিতে এক মঞ্চে সামিল হয়েছিলেন। এ সময়ে পার্টির ভিতরে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক বিষয়টি মূল্যায়ন করার জন্য কুমিল্লা জেলাকমিটিতে আমি একটি প্রস্তাব বেখেছিলাম। কিন্তু এটাকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করা হয়েছিল। আমাব যতদূব মনে পড়ে একটি জেলাকমিটির বৈঠকে প্রাদেশিককমিটির সংগঠক হিসাবে কমবেড মনসুব হবিবুল্লা (বর্তমান আইন মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ) উপস্থিত ছিলেন। আমার আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তির বিষয় তিনি হাস্যচ্ছলে উল্লেখ কবেছিলেন। অধুনা তাঁব সাথে আলোচনায় আসতে পেরেছি ত্রিপুরীদের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে তাঁর তখন কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমি কিন্তু ত্রিপুরা ইউনিটের অনুমোদন নিয়ে এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলাম। উপজাতিদেব উপকথা ও সংগীতের উপব একটি প্রবন্ধ লিখে 'যুগান্তরে' পাঠিযে দিয়েছিলাম। এব একটা সুদূরপ্রসাবী ফল পাওয়া গিয়েছিল। ককবরক ভাষা-ভাষী যুব-ছাত্র সমাজের সাথে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সহকর্মিতা জেগেছিল, কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে উপজাতি ছাত্রাবাসে যাতায়াতের সুযোগ হয়েছিল। পূর্বে আমাদের সম্পর্ক ছিল প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, উষা দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্মাদের মতো শহুরে উপজাতিদের সাথে। এবার তা প্রসারিত হয়েছিল গ্রাম্য ককবরক ভাষাভাষী যুবছাত্রদের মধ্যেই। সকলেই জানেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ ও জাতীয়তাবাদী নেতারা দমন ও কুৎসার মাধ্যমে সামাজিকভাবে

কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন রাখার কি কঠোর প্রয়াস চালাতো। আজো তার অবসান ঘটেনি। জনমঙ্গল সমিতির ভিতরেও শহরের উপজাতিয় মধ্যবিত্তরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতো।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সংগ্রাম ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের উপজাতি জনগণকে সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির হয়েও আমি তখন উপ-জাতিয়দের সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ককবরক জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে জনমঙ্গল সমিতিরই এক অংশ 'চিনিহা' পত্রিকার জন্ম দিয়েছিল। বলতে গেলে উপজাতি মানব গোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য চিন্তা চেতনাকে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের পদ্ধতি পরিহার করে ত্রিপুরা জাতির মাতৃভূমির মঙ্গল সাধনের চেষ্টার নামে কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে উপজাতি জনগণকে দূরে রাখার প্রয়াস চালিয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্টদের আত্মত্যাগী কাজ, সংগঠন ক্ষমতা ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে তারাও অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই তাঁরা 'প্রজার ভোটে সরকার চাই'— এই আওয়াজ সফল করার জন্য কমিউনিস্টদের সাথে একযোগেই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়টাতে ত্রিপুরায় কংগ্রেসীরা গণপরিষদ গঠন করেছিলেন। এর জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিস্ট বিদ্বেষ প্রচার শুরু হয়েছিল। আজ যখন গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের উপর সকল অংশের রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চলেছে তখন মনে পড়ে ত্রিপুরায় এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তুলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কত জটিল পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ত্রিপুরায় জনমঙ্গল সমিতি গড়ে উঠেছিল। তার রাজনৈতিক আওয়াজ ছিল রাজানুগত্যে প্রজার ভোটে সরকার গঠন কর। কমিউনিস্ট পার্টির সেল গঠন করার পরই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্র বিরোধী জনমত ও সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কিছুদিনের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৩৯ সালের ১লা মে তারিখটিতে 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' নামক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। ২২-২-৪২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। পত্রিকাটিতে রাজনৈতিক বিষয়ের প্রাধান্য ছিল এবং অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনগনকে সংগঠিত করতে যথাসম্ভব দায়িত্ব পালন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যেই ত্রিপুরায় রিয়াং প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছিল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে পরে আমি আলোচনা করব। চিন্তার দিক থেকে এই বিদ্রোহের

চরিত্র সম্পর্কে প্রগতিশীল জনমত গঠনের চেষ্টা কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল। ১৯৩৩-৪৭ সালে কমরেড যোশী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বজোড়া ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধের পটভূমিতে পার্টি আইনী কাজকর্ম করার সুযোগ লাভ করেছিল। ত্রিপুরায় উপজাতি সমাজের মধ্যেও রাজতন্ত্রের প্রতি অন্ধ অনুগত্যে চিড ধরেছিল। এই সময় আগরতলা শহরে পুরাতন সন্ত্রাসবাদী ক্লাবগুলির স্থান গ্রহণ করেছিল প্রগতিশীল ক্লাব লাইব্রেরীসমূহ। ১৯৪১-এর আগস্ট মাসে চীন দিবস পালনের উপলক্ষ্যে লাল নিশান নিয়ে আগরতলায় মিছিল বেরিয়েছিল। এটা প্রগতিশীল জনগণের মনে রীতিমত উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। বাজ্যের বিভাগীয় শহরগুলি এবং আগবতলা শহরের প্রতিটি পাড়ায় গোপন ক্লাস করার ব্যবস্থা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু কবে মার্কসবাদী সাহিত্য লাইব্রেরীতে আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর ফলে শহরে মানসিকতায় যে লাল আতঙ্ক ছডানোর বিষক্রিয়া চলেছিল এব থেকে এক অংশের মানুষের মনকে মুক্ত করা গিয়েছিল। এমন কি গানেব মাধ্যমেও সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে প্রচার করার প্রয়াস চলছিল। ১৯৪৩ সালে একদিকে সাধাবণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনে সাংস্কৃতিক ও কৃষক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছিল। এব মাধ্যমে মনিপুর, আসাম ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাংস্কৃতিক ও কৃষক কর্ম্মীদের সাথে ত্রিপুরার সংগ্রামী নেতাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪১ সালেও যথারীতি কৃষক প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হাসনাবাদে ত্রিপুরা জেলা কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেছিল। ('সংকলন' দ্রঃ)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৪০ সালে ১লা মে আগরতলা শহরে রিক্সা ও অন্যান্য শ্রমিক নিয়ে প্রকাশ্যে মে দিবস পালন করা হয়েছিল। ঐ সভায় গোপাল দত্ত প্রধান বক্তা ছিলেন। এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল খোগবাগানে।

১৯৩৯ সালে ঢাকার রায়পুরা দাংগায় যে সব উদ্বাস্ত এসেছিলেন তাদের সাথে রিক্সাচালকও এসেছিলেন। তারা নারায়নগঞ্জ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তারাই উদ্যোগ নিয়ে ত্রিপুরায় রিক্সা ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন।

আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়। বাঙালী হিন্দুউদ্বাস্তুরা যাদের আত্মীয়স্বজন পূর্বেই ত্রিপুরায় চাকুরীতে অথবা ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন

তারা শহরে এসে ভীড় করতে থাকেন। এর মধ্যে কিছু উকিল, মোক্তার এবং কনট্রাকটরও এসেছিলেন। রায়পুরার উদ্বাস্তুদের মহারাণী অরুন্ধতি দেবী 'অরুন্ধুতিনগর' প্রতিষ্ঠা করে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন এবং রায়পুরার বিখ্যাত ডাক্তার ইউ. সি. নাথ একটি আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইটি বর্তমানে এম. বি. টিলা নামে পরিচিত।

আমলাদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রামনগরের মুসলমান কৃষকদের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং মহারাজাকে দিয়ে বিনা ক্ষতিপূরণে মুসলমান প্রজাদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। গণপরিষদ ও জনমঙ্গলের নেতারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯৪০ সালের (১০-১-৪৯ ত্রিপুরাব্দে) গেজেটমূলে শচীন সিংহসহ আমরা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলাম। কংগ্রেসী নেতৃবর্গ আখাউরা থেকেই বহিঃষ্কারের আদেশ প্রত্যাহারের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, আর আমরা গোপনে রাজ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিলাম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে নিজেদের সংযোগ বজায় রাখতে উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরে তখন রিয়াং বিদ্রোহ প্রসার লাভ করছিল। রিয়াং বিদ্রোহ সম্পর্কে তৎকালীন সরকারী দলিলের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। দলিলটি ১৪-৪ ৫৩ ত্রিং তারিখের মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের একটি আদেশ, 'উদয়পুর, অমরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাতের দল ধৃত করা ও সায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রী শ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ অনুসারে অদ্য নিম্নলিখিত রূপ সৈনিক ও অফিসার মেজর শ্রী নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বাধীনে রাজধানী হইতে উপদ্রুত অঞ্চলে রওনা হইতেছে—বডিগার্ড জমাদার (১) শ্রী রমেশ চন্দ্র দেব (২) শ্রী ভারত চন্দ্র দেব। বডিগার্ড আদার র্যাংক ৩০ জন। দুই নং ত্রিপুরা ইনফ্যানট্রির আদার র্যাংক দুই সেক্‌সন। এছাড়া রাজ্যরক্ষী বাহিনীর অফিসার ও কতিপয় রিয়াং সর্দার এবং শাসন বিভাগ হইতে সেনাদলের সাহায্যার্থে পুলিশ মোতায়েন করা হইবে বলিয়াও আদেশ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। উক্ত ডাকাত দলকে ধৃত করার এবং সায়েস্তা করিবার কার্যে মোতায়েন থাকাকালীন ফোর্স কমাণ্ডারস্বরূপ মেজর নগেন্দ্র দেববর্মার প্রতি শ্রী শ্রীযুতের সাক্ষাতের অভিপ্রায় হইলে নিম্নবর্ণিত আদেশ দেওয়া যাইতে পারে :—

(১) মোতয়ানী ফোর্স ডাকাত দল ধৃত করিয়া আগরতলা আনয়ন করিবে।

(২) কোন ডাকাত দল ধৃত করিবার কালে যদি কোন প্রকার বাধা দেওয়া

হয়, তাহা হইলে কমাণ্ডারকে প্রয়োজন ও নিজ বিবেচনা অনুসারে স্বীয় জিম্বায় কার্য আদায় করিবার জন্য ডাকাত দলকে কণ্ট্রোল করিয়া ফায়ার করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে। ফোর্স কমাণ্ডারের অতিরিক্ত ফোর্সের জমাদারগণকেও এরূপ করিবার এবং সৈন্যগণকে সেলফ ডিফেন্স ফায়ার করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) ফোর্স 'মুভ' করিবার সময় কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলকে ফোর্সের কার্যে বাধা দেওয়া প্রতিয়মান হইলে ফোর্স কমাণ্ডার স্বীয় বিবেচনা অনুসারে উক্ত সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলের উপর আত্মসমর্পণের সুযোগ দিয়া ফায়ার করিতে পারিবে।

(৪) ডাকাত দলের বন্দুক, গোলা, দাও, বল্লম প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ ও বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিতে হইবে।

(৫) ডাকাত দলকে বাড়ীতে বা পাড়ায় না পাওয়া গেলে ফোর্স তাহাদিগের বাড়ীতে গিয়া ধান, চাউল, বৃদ্ধ, স্ত্রী লোকজনকে বাহির হইবার সুযোগ দিয়া, সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দিবে এবং ডাকাত দল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাতা পিতা প্রভৃতিকে বিবেচনা অনুযায়ী ধৃত করিয়া রাজধানী লইয়া আসিবে।

(৬) ফোর্স কমাণ্ডারের নিকট রসদের জন্য এবং অন্যান্য কার্য উপলক্ষে টাকা হাওলাদ দেওয়া হইয়াছে। ঐ কার্যাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় আবশ্যক হইলে ফোর্স কমাণ্ডার উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগীয় অফিস হইতে প্রয়োজন স্থলে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা হাওলাদ ও গ্রহণ করিতে পারিবে। বিহিতাদেশ প্রার্থনায় শ্রী শ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাত পেশ হয়। ইতি ১৩-৪-৫৩ ত্রিং। সাক্ষর বি. এল দেববর্মা। মেজর, ও, সি, হিজ হাইনেসেস, বডিগার্ড। ১০-০-২৯৯। সি, তারিখ ২৮-৭-৫৩ ত্রিং উজ্জয়ন্ত পেলেস, খাস সেরেস্তা আগরতলা।

আর একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হল।

To

The Commissioner of Police, Tripura State Agartala.

A batch of Military Troops are very soon be going to Amarpur area under order of His Highness the Maharaja Manikya Bahadur. Please depute 2 constables and 1 S. I. or

A S. I with party on the date required by Major Kumar B. L Deb Barma Bahadur whom you are requested to consult.

By order, Sd/ P. Bhattacharjee
Chief Secretary to His Highness
No. 300/C Dated 10. 4. 43 T. E.

Copy forwarded to Major Kumar B. L. Deb Barma Bahadur for necessary action.

Sd/ P. Bhattacherjee
His Highness

সেহা নং—১৪১/১৪/৫/৫৩ ত্রিং

এই অপাবেশনেব ফলাফল কি ঘটেছিল তাবও একটি সরকাবী বিববণ উদ্ধৃত কবছি :

Tiipura, Place Sultanat Office. Agartala

Rly. Station Akhaura B A Pg টাইম ১২-৩৫ (দুপুব) ২৬/৪।৫৩ ত্রিং ক্যাম্প—অভযপাডা।

নাইশাবায ছডার ডুম্বব, গংত্রাসছডা ডুম্বব, যে স্থানে সেই দস্যু দলেব মস্ত একটি Defence নিযা বসিয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পর টিলার উপর দিযা যাওয়ায় কোন কিছু করিতে পারে নাই। দস্যু দলের উপর বহু সাবধান-সাবধান এখনও ভাল আছে—মহাবাজের জয় দাও তবু তাহারা নানা কথা বলিয়া বসিয়া থাকে। তখন প্রথমে উপরেব দিকে ফায়াব করি, তৎপর ৩নং হইতে পালাইতে থাকে কিন্তু একজন লোক 'তাইন্দুল' নামক রিয়াং বন্দুক নিয়া ফায়ার করার জন্য তৈয়ার থাকে, তবে তাহাকে ফায়ার কবিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি। তৎপর দৌডাইয়া তাহাদের পোষ্টেব জন্য আগাইাতে থাকি, তৎপর শিলরাম নামক একটি বিয়াং বর্তমানে সেও রাজা নামে অভিহিত তাহাকে ধরি ও তাহার সাহায্যে পুরুষ ১০ জন, মেয়ে লোক ১২২ জন, ছেলেমেয়ে ২৩২ জন সর্বমোট ৪৬৪ জন ধরি। সাতটি ক্যাম্পদার বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে মনোরঞ্জন ঠাকুরের নিকট ছয়টি ও একটি পুলিশ ইন্সপেক্টরের নিকট বুঝাইয়া দিয়াছি। দা ৯৪টি, কাঁচি সাতটি তাহাও মনোরঞ্জন ঠাকুরের নিকট বুঝাইয়া দিয়াছি। আর একটি তলোয়ারও দিয়াছি। এ-ক্যাম্পে ত্যাংখারায়, হান্দই সিং, কাঠাল রায়, এ সমস্ত

মন্ত্রী ছিল কিন্তু তাহারা কোথায় কোন্ ডুম্বরে পলাইয়াছে পাওয়া যায় নাই। তাহাদের ধরবার জন্য অনুসন্ধানে আছি। উক্ত লোকগুলির মধ্যে শিলরায়, সালেহা, শিখবাম এরূপ অনেক আসামী পাওয়া গিয়াছে। মনোরঞ্জন ঠাকুরের রিপোর্টে বিস্তারিত খবর পাইবেন। বাকি আসামীগুলিকে ধরার জন্য ৪নং ও ৯নং বাহিনীর অধ্যক্ষগণ চেষ্টা করিতেছে এবং আসামীগণের পাহারার কর্মে সাহায্য করিয়াছে।

(২) নির্দেশ চারিজন পুরুষকে মেয়েদের গাইড করার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল, ও মেয়েলোকগণকে ছাড়িয়া দেওয়ার শ্রী শ্রীযুতের আদেশ থাকায় অভযবাড়ী পযন্ত আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

(৩) দস্যুদল আমাদের সঙ্গে বাস্তবিকই ফাইট দেওয়াব জন্য প্রস্তুত ছিল। তবে আমাদেব সাবধানতাব জন্য কোন কিছু করিতে পারে নাই।

(৪) ইন্সপেক্টার সুবেন্দ্র মজুমদার নতুন বাজার হইতে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া পুনরায় সাক্লাইয়া পাড়ায় join কবিয়া আবাব কালীকুমার চৌধুরীব বাডীব অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে। তাহাব কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। সব সময় আমাদেব সঙ্গে থাকার কথা ছিল।

(৫) যে লোকটির উপর গুলী করা হইয়াছিল সে লোকটিকে First Aid করা হইয়াছিল—উদয়পুরের কম্পাউণ্ডারবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধে কিন্তু উরুটা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর বাঁচে নাই।

(৬) অদ্য আমরা অভয়পাড়া আসিয়া জানিতে পারিলাম শ্রী শ্রীযুত আগরতলায় চলিয়া গিয়াছেন। তাই পুনরায় অমরপুর (বিক্রমপুর) অভিমুখে রওয়ানা হইতেছি। নতুবা উদয়পুরেই শ্রী শ্রীযুতের পাদপদ্মে ৪৬৪ জন লোককে পৌছাইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম।

(৭) বডিগার্ড ২।১ জন সিক (স্বর হইতেছে)।

(৮) বন্দুকগুলির মধ্যে চারটি রাজ্য রক্ষীর বন্দুক।

নম্বর ৭০।৩১।৫৫।৪৩ আর বাকি লোকের ২ (দুইটি)।

(৯) সেলা—অদ্য তিনদিন পর্য্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে থাকায় কোন মেসেজ পাওয়ার সুবিধা হয় নাই। অমরপুর পৌছলে বোধহয় অনেকটা মেসেজ পাইব।

(১০) অমরপুর পৌছানোর পব পুনরায় মেসেজ দিব। S/d নগেন্দ্র।

আরো একটি সরকারী তথ্য বিশেষ প্রয়োজনে উল্লেখ করছি।

২নং সংবাদ

সময়—অপঃ—১—৩টা

স্থান—কুরমা—ঘটনার স্থান

স্বদেশীদলের লোকেরা তর্বং চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ রিয়াং ও শ্রীচরণ রিয়াং-এর বন্দুক তল্লাস করিয়াছিল। তাহারা রাজ্য রক্ষী বাহিনীর ভলান্টিয়ার্স এবং রতন মনির শিষ্য। রাত্রেই তর্বং চৌধুরীকে জরিমানা করিয়া স্বদেশীদলের লোকেরা টাকা আদায় করে। এবং তাহার ছেলের বন্দুক ২টি খামার বাড়ীতে আছে জানিয়া কতক লোক উক্ত খামার বাড়িতে যাইয়া ১ নালী ক্যাপদার ২টি বন্দুক, কতক চাউল, তথা হইতে নিয়া আসে। তারপর তর্বং চৌধুরীর বাড়ির ১টি পালা শূকর বন্দুক দ্বারা মারিয়া পাক করিয়া মাংস খাইয়াছিল এবং তর্বং চৌধুরীর কতক চাউল ও খামার বাড়ীর কতক চাউল, পাক করিয়া ভাত বানাইয়া শুকরের মাংস দিয়া খাইয়াছে। উহাদের খাওয়া দাওয়া হইলে পর তর্বং চৌধুরীকে তৈছরুহা রতনমণির নিকট নিয়া শিষ্য করিবে বলিয়া কোমনের বাক্স খুলিয়া উদালের ছাল ঘরে ফেলিয়া যায়।

S/d I M. Ganguli N. D
(Indra mohan Ganguli)
Naeb Daruga

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় রাজার আদেশে বিদ্রোহীদের ডাকাতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে সিভিল পুলিশের রিপোর্টে বিদ্রোহীদের 'স্বদেশী দলের লোকেরা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংবাদে প্রশাসন কতখানি ক্ষিপ্ত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে লেঃ নগেন্দ্রর নিকট ৫নং মেসেজে ১৮-৪-৫৩ ১ব্রিং লেখা হয়েছে, 'আপনার Message এ, কতজন জখম অথবা মারা গিয়াছে লেখা নাই। লুঠতরাজ জিনিস D. O-এর নিকট বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। D. O-এর নিকট উক্ত জিনিসগুলি তুইনাসীছড়া হইতে আনাইয়া নেবার আদেশ হইয়াছে। এই ছড়া বুহার মাল এবং বন্দীদের উদয়পুর কিংবা অমরপুর পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আপনার রিপোর্ট পরিষ্কার ভাবে position চতুর্দিকের ছড়া কিংবা পাড়ার নাম দিয়া আমাদের লিখবেন। আমার order আছে যে প্রাণে মারিয়া ফেলিতে, কিন্তু আপনার No-3 Report-এ বুঝা যায় আপনারা না মারিয়া আকাশে fire করিয়াছেন। প্রাণে মারিতে হইবে। সর্বদা নিকটস্থ D. O-এর সঙ্গে Communication রাখিবেন। এই ছড়া বুহা দখল করার পর সেখানে যে camp আছে সব camp দখল করিতে হইবে। আপনার জানা আছে যে Lt. Hari 2 see নিয়া বিলোনীয়ার দিক হইতে কল্সী

ছড়া কিংবা লক্ষীছড়া দিয়া এই বুহ ছড়া অথবা অন্য position নেবার জন্য পিছন নিয়াছে। আশাকরি আপনার সঙ্গে Lt. Hari-র দেখা হইতে পারে। বুহ বিলোনীয়ার দিক হইতে পিছন পলায়ন করিতেছে। Amunation কমপড়ার সম্ভাবনা থাকিলে পূর্বেই Report করিবেন।

আরও কিছু reserve amunation উদয়পুর কিংবা অমরপুর পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আপনাদের position পরিষ্কার ভাবে message-এ জাহির করিবেন। 16. 30 hours,

To

Lt Hari

from O/c - B. G. I.

originator, Number 6 Dated 18/4/53 TE.

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৪২-৪৩ সনের মধ্যে বিলোনীয়া, উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগে পঞ্চাশটি ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম ভস্মীভূত হয়েছিল। সারা রাজ্যে সাধারণ রিয়াং প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রিয়াং বিদ্রোহের প্রাথমিক বিস্তৃত বিবরণ কমিউনিস্ট পার্টির কমিল্লা জেলা কমিটির অফিসে পৌছে দিয়েছিলেন। সে সময় পার্টির ভিতর বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ত্রিপুরা রাইফেল্‌স ও রাজ্যরক্ষী বাহিনী তখন জাপ বাহিনীকে মোকাবেলা করার কাজে আরাকানের রথিডং বুথিডং যুদ্ধাঙ্গনে অগ্রসর হচ্ছিল। ত্রিপুরা রাইফেল্‌স-এ কমরেড ঊষা দেববর্মা পার্টির নির্দেশে ক্যাপ্টেন হিসাবে যোগ দিয়াছিলেন। পার্টির নির্দেশে আগরতলা ও তার আশেপাশে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। এটা সমস্ত যুক্ত বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে রতনমুনীর সাথে সাক্ষাৎকারের নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল। অন্যদিকে উদয়পুর অঞ্চলে ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও লুণ্ঠন চলছিল। বেসরকারী মতে সে সময় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হয়েছিল ২০,৪২৫ জন, এর মধ্যে ২০০ জন নারী ও ১২ জন শিশু ছিল।

নির্যাতনের মুখে রিয়াং বিদ্রোহ প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল। তাঁরা প্রতিবেশী ব্রিটিশ বাংলায় কৃষক নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কৃষক-নেতা স্নেহময় দত্ত ছিলেন নোয়াখালী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পার্টির নির্দেশ তাঁর কাছেও পৌছেছিল। যতটুকু জানা

যায় রতন মুনির সাথে পার্টির আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম সীমান্তে এগিয়ে আসা জাপ বাহিনীর প্রতি তার আস্থা ছিল বেশী এবং তিনি যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। উদয়পুর থেকে লক্ষ্মীছড়ায় যখন মুখোমুখী সংঘর্ষে রতনমুণী লিপ্ত হয়েছিলেন সে সময় উদয়পুরে বিদ্যা দেববর্মা টি. এম. বি. এল-এর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কমরেড বিদ্যা পরবর্তী সময়ে গণমুক্তি পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা, পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ১৯৭৭ সালের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছিলেন। তখনও অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীর চোখে রিয়াং বিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়েনি। তাই ত্রিপুরী ও জমাতিয়া উপজাতি যুবকদের স্বাধীনতা রক্ষার আওয়াজ তুলে রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো সম্ভব হয়েছিল। এই দমন নীতির মূলে শান্তির বাজারের নিকট লক্ষ্মী ছড়ায় শেষ সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহী নেতারা সীমান্ত অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিলেন। এই প্রবেশের মুখেই তাঁদের নেতা রতনমুণী ধৃত হয়েছিলেন। তাঁকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে ত্রিপুরা মহারাজার হাতে তুলে দিয়েছিল। সে সময় ত্রিপুরা পুলিশ এবং ব্রিটিশ পুলিশেরা যুক্তভাবে অমরপুরে দেবী রায় রিয়াং, খোয়াই-এর রামশীরা গ্রামে চৈত্র সেন নোয়াতিয়া, দক্ষিণ মহারাণীর তাংনাং ফা রিয়াং-বিলোনীয়া মনুপাথায়ের রবিরায় রিয়াং এবং সহুয়া রিয়াংকে গুলি করে হত্যা করেছিল। এ ছাড়াও এই নিহতদের তালিকায় রয়েছে নোয়াখালি রামগড়ের চৈত্র সেন নোয়াতিয়া ও থৈরী সেন নোয়াতিয়ার নাম। এই তালিকা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে রিয়াং ও নোয়াতিয়া, যারা নোয়াখালি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করত, তাদের মধ্যেও এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটেছিল। এই এলাকাটিতে ত্রিপুরার বাইরের অংশে আজও উপজাতিদের প্রচণ্ড অসন্তোষ থেকে ধুমায়ীত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সমকালে এত বড় একটা বিদ্রোহের সমর্থনে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পার্টির প্রায় নির্ভুল হস্তক্ষেপ ত্রিপুরায় গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলনের উপর একটি বিশেষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তখন আমাদের পার্টি ত্রিপুরার জনমঙ্গল আন্দোলনের নেতাদের এই নির্বিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং রতনমুণীকে হত্যাসহ সমস্ত বিষয়টির তদন্তের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির এক অংশ এবং জনমঙ্গলের নেতাদের মধ্যে ইতস্ততভাব ছিল। কারণ এর ফলে কমিউনিস্ট ও জনমঙ্গলের মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের মহারাজা পুনরায় গ্রেপ্তার হবার

সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে আমরা যখন একক ভাবে এই কাজে অগ্রসর হব বলে চাপ সৃষ্টি করি তখন জনমঙ্গল সমিতির সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা সম্পাদক ও প্রভাত রায় আমাকে স্মারক-পত্র রচনা করে তৎকালীন মুখমন্ত্রী রানা বোধজং বাহাদুরের নিকট পেস করার অনুমোদন দিয়েছিলেন। এই স্মারকপত্রটি 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথায়' প্রকাশ করা হয়েছিল। অবশ্য বিলম্বে হলেও ১৯৪৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জজ অখিল মজুমদার, নন্দলাল দেববর্মা, জীতেন দেববর্মা এবং রিয়াং মিসিপ হরচন্দ্র দেববর্মাকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনের প্রতিবেদনে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ ছিল এবং মূলত এই বিদ্রোহের কারণ হিসাবে দুর্ভিক্ষকেই সম্মুখে তুলে ধরেছিল। দুর্ভিক্ষ ঘটার কারণ হিসাবে বীরবিক্রম কিশোর-এর ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মূল্যস্বরূপ নিম্নলিখিত কার্যাবলীকে দায়ী করা যায়ঃ

(1) The entire resources of the state and personal service of the cheek been placed at the disposal of the crown,

The amount of donation made by the state to the various war funds total Rs. 75,000/- and by the employes Rs. 14,000/- defence bonds purchased by the state amounts Rs, 175,000/- and by the public through the state Rs, 44,000/-

The state has promised an annual donation of Rs. 50,000/- to the war purposed fund and the employes Rs, 7,000/-

The total amount of expenditure incured on Armed Forces is above Rs, 5,00,000/,- [war suppliment to the Tripura state gazettee, January 14, 1942 pous 30, 1315 T. E.]

বঙ্গানুবাদ :

১। রাজ্যের সমস্ত সম্পদ ও শাসক মহারাজার নিজস্ব ব্যাক্তিগত শক্তিসমূহ ইংরেজ শাসকদের অজ্ঞাধীনে সমর্পিত হয়েছিল।

২। ইংরেজের যুদ্ধ তহবিলে বিভিন্ন খাতে নিম্নরূপ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। রাজ্যের দান ৭৫,০০০ টাকা কর্মচারীদের দান ১৪,০০০ টাকা ডিফেন্স বণ্ড বিক্রি বাবদ ১,৭৫,০০০ টাকা জনগণ থেকে আদায়কৃত রাজ্য সরকারের দান ৪৪,০০০ টাকা।

রাজ্য সরকারের বার্ষিক নিয়মিত ৫০,০০০ টাকা এবং সরকারী কর্মীগণ বার্ষিক ৭,০০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল।

সৈন্য বাহিনীর জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এই রাজ্যে তখনকার দিনে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা কঠিন ছিল।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর সারা ভারত কৃষক সভার ভাকৃনা অধিবেশনে মণিপুর সংক্রান্ত প্রস্তাবে উল্লেখ আছে। বর্মা সীমান্তের যুদ্ধে মণিপুর রাজ্যে বোমাবর্ষণ ঘটতে থাকে, এ-রাজ্যে কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। ১৯৩৯ সালে কৃষক নরনারী বিধানসভার দাবীতে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিল। প্রজামণ্ডল বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। জাপানী বোমাবর্ষনের মুখে রাজধানীকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে প্রশাসন শিলচরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কৃষকসভা তখন দাবী করেছিল জাপান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যই জনগণকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারত সরকার ও মণিপুরের যুক্ত উদ্যোগে একদিকে জনগণকে ত্রাণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা, অন্যদিকে তাদের মনোবল দৃঢ় করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। (সারা ভারত কৃষক সভার ইতিহাস, মহঃ আব্দুল্লাহ রসুল)। আরাকান থেকে মণিপুর পর্যন্ত যে তড়িৎগতি আক্রমণ শুরু হয়েছিল তা ত্রিপুরার অদূরে আরাকান সীমান্ত রথিডং বুথিডং-এ পৌঁছেছিল। ত্রিপুরারাজ্য, কুমিল্লা ও আশেপাশে বিপুল পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ ঘটেছিল। সিঙ্গারবিল বিমানঘাটি স্থাপিত হয়েছিল। সিংগারবিলে রেল সংযোগকারী আগরতলা স্টেশন স্থাপিত হয়েছিল। একদিকে সরকারী প্রতিরক্ষামূলক এইসব ব্যবস্থা অন্যদিকে মন্বন্তর। এর কাহিনী আজও মানুষের স্মৃতিতে আছে। এই সময় শ্রেণী ও গণআন্দোলনের অবস্থা, এর উপর কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বগত ও সংগঠনগত সংগ্রাম যদি নির্ভুল না হত, কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষুদ্র ইউনিট সমূহের অবদান যদি ইতিবাচক না হত, তাহলে লেখ্য ভাষাহীন ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার পথে নিয়ে আসা সম্ভব হত না।

রিয়াং বিদ্রোহের উপর কমিউনিস্টদের উত্থাপিত তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী স্বীকৃত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা মুক্তি পেতে থাকেন। বিদ্রোহের নেতা বন্দী রতনমুনীকে আগরতলা রাজপ্রসাদের নীচুতলায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল!

বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এই বিদ্রোহীদের বিপ্লবী সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন প্রদান করেছেন। উপজাতি রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব এবং ককবরক ভাষাভাষী উপজাতি জনগণের জাতীয়:

সংস্কৃতির উন্নয়নে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র উপজাতি জনগণকে পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

জনশিক্ষা সমিতির উদ্ভব

স্বতঃস্ফূর্ত রিয়াং বিদ্রোহের মূল্যায়ন করে তৎকালীন স্বাধীনতা পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মহারাজাকে একটি পত্র দিয়াছিলেন ঃ

৩৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ডিসেম্বর –৯, ১৯৪৫।

হিজ হাইনেস মহারাজা
মাণিক্য বাহাদুর,
ত্রিপুরা ষ্টেট
ত্রিপুরা (বেঙ্গল)

প্রিয় মহারাজা সাহেব,

আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, ত্রিপুরা রাজ্য গণ-পরিষদ এবং ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের অনেক সদস্য বিনা বিচারে দীর্ঘকাল ধরে কারাগারে আছেন। যুদ্ধের শুরুতে স্পষ্টই তাদের বহু সংখ্যক বিনা বিচারে কাবারুদ্ধ হয়েছিলেন। তারা বাংলা সরকারের না ত্রিপুরা রাজ্যের বন্দী, আমি জানি না। আরও সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যে এই বন্দীদেব প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার কবা হচ্ছে এবং তাদের কয়েকজন মাবাত্মক অসুখে ভুগছেন। আমি আবও জানতে পেরেছি যে ১৯৪০ এর আরম্ভ থেকেই সমস্ত সভা এবং মিছিল এবং অন্যান্য বিক্ষোভ প্রদর্শন রাজ্যটিতে নিষিদ্ধ এবং কোন প্রকারেব নাগবিক স্বাধীনতাব অস্তিত্ব নেই। আমি আশ্চর্য হই যে আজকের ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে ঘটনাবলীর এমন অবস্থার অস্তিত্ব থাকতে পারে। আমার তথ্যগুলি যদি ভুল হয় আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে শুধরিয়ে দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। যদি সেগুলি ভুল না হয়, আমি বিশ্বাস করি আপনি অনুগ্রহপূর্বক রাজ্য প্রসাশনের এই কলঙ্ক অপমোদন করবেন। আমি খুশী হবো যদি একটি উত্তর আনন্দভবন, এলাহাবাদ আমার বাড়ীর ঠিকানায় আমার নিকট প্রেরীত হয়।

ভবদীয়—
স্বাঃ জওহরলাল নেহরু।

উপজাতি ককবরক ভাষাভাষী শিক্ষিত যুবছাত্র সমাজ কতখানি আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার মধ্যে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির ছোট কর্মীদল সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক জনগণকে দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে একটি মঞ্চে মিলিত করা এবং শ্রমজীবী কৃষক অংশের জনগণকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা এই নীতিই গ্রহণ করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দশরথ দেবের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"জনশিক্ষা সমিতির গঠনের নেপথ্যে প্রেরণা-দাতা ছিলেন কমরেড বীরেন দত্ত। ত্রিপুরার গণআন্দোলনের ইতিহাসে আর একটি অবিস্মরণীয় নাম।" (ইয়াপ্রী, ১১ই জুলাই) বীরেন দত্ত একক এ-কাজ করেননি। কমিউনিস্ট পার্টিব যে ইউনিটেব নির্দেশে কাজ হয়েছিল সেটা ছিল কুমিল্লা জেলা কমিটির অধীন। কুমিল্লা জেলা কমিটি ছিল যুক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির অধীন, এভাবে সর্বভারতীয় পার্টির সাথে যুক্ত ছিল। তৎকালীন পার্টি সংগঠনে ফেডারেলিজম-এর কল্পনা কবা ছিল অসম্ভব। আগবতলায় যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন সেলে কাজ করতেন তাঁহাদের মধ্যে কিছু নাম আমার মনে আছে যথা, দেবপ্রসাদ সেন, অনন্তলাল দে, নলিনী সেনগুপ্ত (আন্দামান ফেবত), জীতু দত্ত, গোপাল দত্ত, চঞ্চল দত্ত (ধীরেন দত্ত), টিপু চৌধুবী, সুশীল দেববর্মা, কান্ত দেববর্মা (এবা ছিলেন মুক্ত রাজবন্দী)। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যুবছাত্র হিসেবে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে মনে পড়ে রবি দত্ত, শান্তি দত্ত, কানু সেন, বেণু সেন, কালা মিঞা, ননী সেন, নিলু চৌধুরী, মহেন্দ্র দেববর্মা প্রভৃতির নাম। কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্কিম চক্রবর্তী (আন্দামান ফেরত) আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময় জ্যাকশন গেইটের নিকট রামকিংকর সাহার দালানে একটি মিষ্টি ও বইয়ের দোকানে অনেক ছাত্র-যুবক মিলিত হয়। তারা মার্ক্সবাদী সাহিত্য পড়তে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে রবি দত্ত, কানু সেন, শান্তি দত্তরা পার্টি কার্ডও পেয়েছিলেন। এই স্তরে আমাদের পার্টির ভূমিকার আর একটি বিশ্লেষণমূলক স্মারকপুস্তিকা 'সংকলন'-এর ৩য় পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি: পশ্চাৎপদ একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্য তাদের চেতনার মান উন্নয়ের লক্ষ্যে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক জ্যোতির্ময় রেখা। একই সঙ্গে সংস্কৃতিক পরিণয়ে ফসল তুলে ধরলেন বীরেন দত্ত ১৯৪৫-এ প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গের গণসংগীত ও গণচেতনা' গ্রন্থে। একদিকে যেমন আছে উপজাতি

সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে আছে ত্রিপুরায় বসবাসকারী বাংলার মানুষের সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি।

ঃজনশিক্ষা সমিতির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড দশরথ বলেছেন, 'বিশুদ্ধ শ্রেণী চেতনার ভিত্তিতে না হলেও শোষণ, বঞ্চনা, মহাজনী শ্রেষ্ঠ শোষণের বিরুদ্ধে উপজাতি জমগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির সেই প্রচার আন্দোলন। ঘুমন্ত উপজাতিদের জাতীয় জীবনে এনে দিয়েছিল এক প্রাণস্পন্দন।' (জ্বালা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন করে তোলার জন্য সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় পরিকল্পনা ছিল। স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। একথাটি মনে রাখলে ত্রিপুরার সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি জনগণ যে আজ একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসাবে ভারতের সমগ্র উপজাতি জণগণের পথ প্রদর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করা যাবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে নির্যাতিত উপজাতিগণের মুক্তসংগ্রাম ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই—এ কথাটা তাদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আমি এখানে জনশিক্ষা সমিতির স্রষ্টা কমরেড দশরথ দেবের লেখা থেকে আরো একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"বংশানুক্রমে ত্রিপুরায় ১৬৪ জন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উপজাতিরা এই রাজাদের একান্ত অনুগত ও বংশবদ। তাহারা রাজাদের স্বয়ং নর-নারারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে উপজাতিরা কি পাইলেন? যুগ যুগ ব্যাপী উপজাতিরা রাজানুগত থাকিয়া উপজাতিরা অজ্ঞ, নিরক্ষর, মুর্খ ও গরীব বলিয়া আজ নিজ বাসভূমিতে পরবাসীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। উপজাতিদের ভাগ্যাকাশে এই কুঝজ্‌টিকাকে অপসারণ করিবে কে? উপজাতিদের আজ একথাটা উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে। (জ্বালা, ঐ।

উপজাতিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই স্তরে আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কুমিল্লা জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম। একালে পার্টি খাতে আত্মনিয়োগ করে তার জন্য জেলা কমিটিতে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেদিনও কমরেড বৈদ্যনাথ মজুমদার (বর্তমানে ত্রিপুরারর পূর্তমন্ত্রী) এবং কমরেড ভানু ঘোষ (মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক)

আমাকে ঠাট্টাছলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'আপনি তো মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতেন, আপনাকে কুমিল্লা জেলা কমিটি খুঁজেই পেতনা।'

সত্যিই ত্রিপুরার দুর্গম পর্বতমালা একবার ঘুরে আসতে আমার মাসাধিক কাল লেগে যেত। জনশিক্ষা সমিতির ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রতিক্রিয়াশীলদের শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। এর প্রতিরোধের জন্য শাসকশ্রেণীর উচ্চমহল এবং ঠাকুর, কর্তা স্থানীয় ব্যক্তিগণ 'সেবা সমিতি' নামে একটা সংগঠন তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহারাজা নিজেই কি কারণে এই সংগঠনকে ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৪৬ সালে প্রজামণ্ডলের পাল্টা সংগঠন হিসাবে 'ত্রিপুরা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংঘ গঠনের সময় জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবর্গ, প্রজামণ্ডলের প্রগতিশীল নেতৃবর্গ ও কমিউনিস্ট নেতৃবর্গেব মধ্যে গভীরভাবে আলোচনা হয়েছিল। জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলদের নেতৃত্বে এটাই ঠিক হয়েছিল যে ত্রিপুরা সংঘই উভয় সংগঠনের শত্রুপক্ষ হিসাবে কাজ করবে। কমিউনিস্টদের এই কথা তারা বিশ্বাস করেছিলেন। প্রজামণ্ডল ও জনশিক্ষা সমিতির অগ্রগতিতে কমিউনিস্ট কর্মীদের অকুণ্ঠ সহায়তাদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সর্বভারতীয় জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের পরিপেক্ষিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে একত্রিত করা ও সমাজের পিছিয়ে পড়া উপজাতি অংশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত করাই ছিল কমিউনিস্টদের লক্ষ্য, যদিও কমিউনিস্টরা তখন প্রকাশ্যে প্রজামণ্ডলেব মধ্যেই কাজ করতেন। কাজেই পরামর্শের ক্ষেত্রে তাবা আমাদের ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টির সাথে খোলাখুলিভাবে যোগ দিতেন। ত্রিপুবা সংঘের নির্বাচনেব ব্যাপাবে আলোচনাক্রমে জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের নেতৃবর্গেব হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিপুরা সংঘের কেন্দ্রীয কমিটিতে হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্যা দেববর্মা ও বংশী ঠাকুর নির্বাচিত হয়েছিলেন। মহারাজার উদ্দেশ্য এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি তাদের গ্রেপ্তার করে রাজপ্রসাদে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করেন। এই কাহিনী আজও লোকমুখে প্রচলিত আছে। ত্রিপুবা সংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পার্টির উপজাতি সমর্থকরা সহজেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ত্রিপুরা সংঘ মহারাজা ও বডলোকদের সংগঠন। তাই জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের নেতৃবর্গকে এভাবে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হয়েছে। জনশিক্ষার নেতারা গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বিস্তার করছেন, প্রজামণ্ডল প্রজার ভোটে সরকার চায়, কৃষিঋণ মুকুব কর, তাইতুং নিষিদ্ধ কর, পথঘাট গডে তোল ইত্যাদি

জনপ্রিয় স্লোগান নিয়ে অনেক মিটিং মিছিল করে। এই সব আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন কমরেড হেমন্ত, সুধন্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। একটা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ঐক্যবদ্ধ মোর্চ্চার প্রতি ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সকল অংশের মনে ইতিমধ্যেই আগ্রহ সঞ্চার করেছিল। রিয়াং বিদ্রোহের কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতার চরিত্র এ থেকেও উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরায় প্রজামণ্ডল গঠিত হয়েছিল। আগেকার জনমঙ্গল সমিতি এবং বর্দ্ধিষ্ণু জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবর্গ এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের একত্রিত করেই প্রজামণ্ডল একটা সাধারণ প্ল্যাটফরম হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এবারে দায়িত্বশীল শাসনের দাবী অনিচ্ছুক মহারাজার হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। এই শ্লোগান প্রজামণ্ডলের বিভিন্ন সভা সমাবেশে সজোরে উত্থিত হতে শুরু করেছিল। এর কারণ ছিল। সারা ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসও দায়িত্বশীল শাসনের আওয়াজ তুলেছিল। এ সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা আমি কমরেড সুধন্য দেববর্মার লেখা 'ত্রিপুরা সংঘের শেষ পরিণতি' নামক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি :

"ইতিমধ্যে গোয়ালিয়রে প্রজামণ্ডল কনফারেন্স হতে যাচ্ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজামণ্ডলের তরফ থেকে কি করে প্রতিনিধি পাঠানো যায় এ নিয়ে শ্রীযুত যোগেশ দেববর্মার বাসায় এক বৈঠক বসেছিল। তিনি ছিলেন সে সময় প্রজামণ্ডলের সভাপতি। প্রথমে কমরেড বীরেন দত্ত ও বীরচন্দ্র দেববর্মার নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল, পরে সুধন্যা দেববর্মার নাম উঠলে এবং তিনি সম্মতি জানালে প্রশ্ন উঠে ত্রিপুরা সংঘের কার্যকরী কমিটির সভ্য হয়ে তার পক্ষে প্রজামণ্ডলের কনফারেন্সে যোগ দেওয়া ঠিক হবে কিনা। সুধন্যা দেববর্মা তার যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করলে আর কোন কথা উঠেনি।

"সারা ভারত প্রজামণ্ডলের সভাপতি শেখ আবদুল্লা গোয়ালিয়রে উপস্থিত ছিলেন না। স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন এবং পট্টভি সীতারামাইয়া উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিনজন কমরেড বীরেন দত্ত, বীরচন্দ্র দেববর্মা ও সুধন্যা দেববর্মা গোয়ালিয়র কনফারেন্সে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। দেখা গেল ইতিমধ্যে শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ও তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত প্রজা পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে কনফারেন্সে বসে আছেন। প্রশ্ন উঠল প্রথমোক্ত তিনজন প্রজামণ্ডলের তরফ

থেকে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবেন না সুখময়বাবুরা প্রজা পরিষদের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করবেন। অনেক বিতর্কের পর স্থির হল শুধুমাত্র কনফারেন্সে যোগ দেবার অধিকার প্রথমোক্ত দলের থাকবে, বক্তব্য রাখবার অধিকার থাকবে না।"

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, এই প্রজামণ্ডলের কনফারেন্সে কমরেড পি. সি. যোশী উপস্থিত হয়ে পার্টি সভ্যদের পরিচালনা করছিলেন। সে সময় প্রশ্নটা ছিল ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা পাকিস্তানে যাবে। আমাদের একথা বলা হয়েছিল যে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে গণতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ পাবে। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিকাশের সুযোগ কম হবে। অবশ্য এসব কথা বীরচন্দ্র অথবা সুধন্যার জানা ছিল না। কমরেড যোশী অগ্রসর হয়ে নেহরুকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা প্রজামণ্ডলের গণভিত্তি আছে। এদের আন্দোলন ভারতে অন্তর্ভুক্তির অনুকূলে গেলে ভারতের পক্ষে লাভ হবে। তাই আমরা দর্শক প্রতিনিধি হিসাবে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ত্রিপুরায় ফিরে এসে যখন আমরা এই চক্রান্তের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলাম তখন কংগ্রেসপন্থীরা জনসাধারণ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এখানে আমি আবার 'ত্রিপুরা সংঘের' কথায় আসছি। কমরেড সুধন্যার উক্ত প্রবন্ধ থেকে আরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ত্রিপুরা সংঘের গঠনের পর মাত্র কয়েকবার কাযকরী কমিটির বৈঠক বসেছিল। ইহার পর বৈঠকের কোরাম গঠন করাই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। মহারাজা ত্রিপুরা সংঘের উপর দুটি বিশেষ কর্তব্যভার অর্পণ করেছিলেন এবং তা কার্যকরী করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। একটা হল পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে বন্দুকের লাইসেন্স বিলি করা এবং অপরটি হল বিনা নজরে তিন বছরের জন্য মিনায় খাস জমি উপজাতিদের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। মহারাজার মৌখিক নির্দেশ ছিল এ দুটি কাজ যেন সত্বর সমাধা করা হয়। মহারাজা ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা ঘোষণা করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে ভূমিহীন উপজাতি অতি সত্বর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

একটা গণসংগঠন মারফৎ বন্দুক লাইসেন্স দেওয়ার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা নিয়ে হয়ত বিতর্কমূলক যুক্তির অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের আমলে মহারাজাদের শাসন ব্যবস্থায় কোন অসুবিধা থাকার কথা নয় ; প্রয়োজনে যে কোন বিধান প্রণয়ন করার অবাধ ক্ষমতা মহারাজার ছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে উপজাতিদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঠিক

অগ্রগতি মহারাজাকে এই দুটি নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছাতে সাহায্য করেছিল। তিনি অবশ্য এক ঢিলে দুই পাখী মারার জন্য এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রজামণ্ডল এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে কমিউনিস্ট পার্টিসংঘ অনুমোদিত বন্দুক আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। যার ফলে রাজভক্ত সর্দারগণের হাতেই বন্দুক যায়নি, আন্দোলনের নেতাদের হাতেও বন্দুক এসেছিল। অপরদিকে 'রাজার রিজার্ভ' সম্পর্কে পার্টি উপজাতিদের রক্ষা কবচ হিসাবে এটাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কারণ উদ্বাস্তু আগমণের স্রোত তখন অব্যাহত ছিল।

মহারাজার ধারণা ছিল যেহেতু তখনও বাঙালীদের মধ্যেই কমিউনিস্ট ইউনিটগুলি কাজ করছিল তাই তারা এই রিজার্ভ সমর্থন করবে না। ফল হলো উল্টো। কংগ্রেস নেতারাই এর বিপক্ষে গিয়েছিলেন। তারা আজও উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরোধী। ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মহারাজা মারা যান। কিন্তু তিনি মৌখিকভাবে ভারতে অন্তর্ভুক্তির কথা ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন। মহারাজার মৃত্যুর পর একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বিভক্ত ভারত স্বাধীন হয়েছিল। এই বৎসরেই অক্টোবর মাসে নোয়াখালীর ভয়াবহ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েক সহস্র উদ্বাস্তু আগরতলা শহরে প্রবেশ করেছিলেন। সরকারীভাবে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সেক্রেটারী রানা বোধজং এবং মন্ত্রী তমিজউদ্দীনকে নিয়ে একটি রিলিফ কমিটি ত্রানের কাজ শুরু করেছিল। এ কাজে এমন দুর্নীতি চলছিল যা সাধারণ উদ্বাস্তুগণ বুঝেছিলেন যে এরই বিকল্প হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। এর ব্যাপকতা নিম্নলিখিত আবেদন পত্রটি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে।

"ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল রিলিফ কমিটির আবেদন।" –

ব্রিটিশ ভারতের উপদ্রুত এলাকা হইতে আশ্রয় প্রার্থী নরনারী দলে দলে ত্রিপুরা রাজ্যে আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সম্পদহীন। এমন কি অনেকেই কপর্দক শূন্য। তাহারা কতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই? যতদিনই থাকুক তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তাহাদের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া শিশুদের দুধ, বার্লির ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সমস্যা বড়ই গুরুতর, দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। মহামান্য ত্রিপুরা সরকারের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা এবং সর্ব-

-সাধারণের সর্ব প্রকার সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়। উল্লিখিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণকে লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ইতি—সন ১৩৫৬ ত্রিং, তাং ২রা কার্তিক

শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্ম্মা

সেক্রেটারী,

আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য

কুমার রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুর-সভাপতি, হেমন্তকুমার দেববর্মা বাহাদুর-সহ সভাপতি। লক্ষবীর জং বাহাদুর, মহারাজ কুমারী শ্রীল শ্রীমতী কমলপ্রভা দেবী, বিক্রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, কুমারী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী-এসিঃ সেক্রেটারী কুমারী জাহেদা খাতুন, অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ রায়, বি. এল. প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল-আব্দুল আজিজ মুন্সী। এলাহি বক্স, মার্চেন্ট-মহেন্দ্র চন্দ্র সাহা, মার্চেন্ট-নিরঞ্জন দেববর্মা, এম. বি জীতেন্দ্রনাথ বসু এম. বি. (কেপ্ট), প্রফুল্ল রক্ষিত, ডাক্তার-তমিজউদ্দিন মুন্সী, উকিল-ডাঃ মিস্ মণিকা চৌধুরী, এম. বি. আশুতোষ চক্রবর্তী, প্রভাত চন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্র নাথ ভৌমিক, যোগেন্দ্র নাথ সেন, সি. এম টি. সি. বীরেন্দ্র নাথ ভৌমিক, ক্যাসিয়ার ভূপেন্দ্র নাথ ভৌমিক, আছাব আহম্মদ চৌধুরী, প্রদীপ্ত চন্দ্র দেববর্মা, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, নান্নু মিঞা, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, মাধবজিৎ সিংহ, সত্যব্রত সিংহ, ললিত মোহন দেববর্মা (কালু), হৃষিকেশ দেববর্মা, শ্রীশ চন্দ্র চৌধুরী, এসিঃ সেক্রেটারী-শ্রীমতী হিরণবালা রক্ষিত, দেবপ্রসাদ সেন, বীরেন্দ্র দত্ত, এসিঃ সেক্রেটারী-গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীমতী বিনীতা দেবী, সতীশচন্দ্র মজুমদার, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, কালা মিঞা, কণ্ট্রাক্টার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা ব্যতীত অন্য প্রকার দানও সাদরে গৃহীত হইবে।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ডাঃ বিজয় কুমার বসুর নেতৃত্বে একটি রিলিফ কমিটি ত্রিপুরায় এসেছিল। এর সেবামূলক কাজের প্রভাব উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিশেষভাবে পড়েছিল। প্রতিটি সৎ নাগরিক, ছাত্র যুব-নারী সংগঠনে অগ্রসর হয়ে এই রিলিফ কমিটির কাজে সহায়তা করেছিলেন।

পার্টি পত্রিকা, গণসংগঠনসমূহ ও সাধারণ গণতান্ত্রিক নরনারী ত্রিপুরায় কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটাতে দেয়নি। তৎকালীন ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলিতে গান্ধীজীকে নোয়াখালি ছুটে আসতে হয়েছিল। ত্রিপুরার চারিদিকে দাঙ্গার আগুন ত্রিপুরার সংখ্যালঘু মুসলমানদের ভীত সন্ত্রস্ত করেছিল। কিন্তু তারা কমিউনিস্ট

পরিচালিত গণ-আন্দোলনের ছত্রছায়ায় নির্ভয়ে জীবনযাপন করেছিলেন। উপ-জাতিরা উস্কানী সত্বেও' সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পথে পরিচালিত হয়নি। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর পাকিস্তান ও ভারতের দাবীর সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য কোনদিকে যাবে স্থির কবতে বিলম্ব করছিল। কাশ্মীর সমস্যা সমাধান আজও হয় নি। জুনাগড় ও হায়দ্রাবাদের ঘটনা সকলেই জানেন। দুটো বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই ভূমিগ্রাসের কামনা ছিল। সাম্রাজ্যবাদ-এর সুযোগে হারানো ক্ষমতা যতবেশী কুক্ষীগত রাখতে পারে তার চেষ্টা করছিল। ত্রিপুরা তখনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের মধ্যে রিজেন্সি কাউন্সিলের মন্ত্রী দুর্জয়কিশোর দেববর্মা বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি স্থানীয় কিছু মুসলিম নেতার সহযোগে ত্রিপুরাকে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে রিজেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে দিয়ে এস. ভি. মুখার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করে ত্রিপুরায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের এই নিয়োগের মধ্যে অভিসন্ধি ছিল। কারণ ভারত অন্তর্ভুক্তির কোন লিখিত চুক্তি ত্রিপুরার মহারাজা করে যেতে পারেন নি। এই অবস্থায় পাকিস্তান সীমান্তে ত্রিপুরাকে বলপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে বড় বড জনজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব জমায়েতের নেতৃত্ব দিয়েছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টি. আলি। রাজ্যে তখন যে ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়েছিল তা এখন কল্পনা করা কঠিন। একদিকে দুর্জয় কর্তার নেতৃত্বে 'সেংক্রাক বাহিনী' গঠিত হয়েছিল, অপরদিকে শহরেরই সীমান্তে বড বড মুসলিম জনজমায়েত সংগঠিত হয়েছিল। সেংক্রাকের প্রচার ছিল বাঙালী উদ্বাস্তরা ত্রিপুরাকে গ্রাস করে ফেলছে। উপজাতি ও মুসলিমদের বাঁচার একমাত্র উপায় হল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়া। "এছাডা ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের উদ্যোগে সংঘটিত হরিগঙ্গা বসাক রোডে বিরাট মুসলিম সম্মেলনের মোকাবিলায় অগ্রণী হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামণ্ডল তথা কমিউনিস্ট পার্টি। তদুপরি-দুর্জয় কর্তা প্রমুখ কয়েকজন নেতার চক্রান্তে সমতলবাসী বিরোধী সেংক্রাক আন্দোলনের বিরোধিতা মুখ্যতঃ তারাই করেন। ফলে সদ্য জাগ্রত একটা জাতির মধ্যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বীজ দানা বাঁধার আগেই একটা আন্তর্জাতিক দর্শন প্রবেশ করল।"—মণিময় দেববর্মার (প্রজা আন্দোলনের কিছু তথ্য) দ্রষ্টব্য।

পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে পড়েছিল এই কারণে যে ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত

এস. ভি. মুখার্জী চক্রান্তের' সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য হল ত্রিপুরা। হিন্দু রাজা ও হিন্দু উপজাতি প্রজাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। সংখ্যালঘু হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টি তখন কাজ শুরু করে দিয়েছিল। এই কাজ পরিচালিত হচ্ছিল জনশিক্ষা সমিতি, প্রজামণ্ডল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ ছিল ত্রিপুরাকে যেভাবেই হোক ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা এই কমিটিগুলির মাধ্যমে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। মহারাজার মৃত্যু ঘটেছিল ১৭-৫-৪৭ ইংরেজীতে। ১২-৮-৪৭ পর্যন্ত দিনগুলি কেটেছিল প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে মাতা মহারাণী নিম্নলিখিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন। ১২-৭-৪৭ তারিখে প্রজামণ্ডলের সংখ্যায় প্রায় পাঁচ সহস্র সশস্ত্র ভলান্টিয়ার বাহিনী আগরতলায় অভিযান করেছিল। এই অভিযানে রাজ্যরত্ন এস. ভি. মুখার্জীর পদত্যাগ ও ভারতের অন্তর্ভুক্তির দাবী সজোরে উত্থিত হয়েছিল। এই জনসভায় কুমার রমেন্দ্রকিশোর বক্তব্য রেখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসী সরকার কায়েম হয়েছিল। আমাদের প্রেরীত বিস্তৃত বিবরণ তাঁর হাতে পৌছানর পর ৪-৯-৪৭ তারিখে রাজ্য এস, ভি, মুখার্জীকে তার পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন এবং কুমার দুর্জয় কিশোরকে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলেন। সাথে সাথে এ, বি, চ্যাটার্জীকে ত্রিপুরার দেওয়ান করে পাঠিয়ে ছিলেন।

শ্রী শ্রীমতী মাতা মহারাণী মহাদেবী মহোদয়ার বাণী

২৪শে কার্তিক—১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দ

"এই রাজ্য ভারতীয় রাষ্ট্রের বিগত ১৫ই অগস্টের পূর্বেই যোগদান করিয়াছে আপনাদিগকে ও অন্যান্য সকলকে আমি ইহাও আশ্বাস্ দিতেছি যে আমরা সবদাই আত্মরক্ষার্থে ব্যবস্থা করিব এবং আমাদের প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষে সর্বপ্রকার আক্রমণ পদ্ধতিকে দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা প্রদান করিব"

এই সংবাদ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রগতিশীল জনগণ নিজেদের বিজয়ী মনে করেছিলেন। কার্যত ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর

রিজেন্ট মাতা মহারাণী ত্রিপুরাকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালের মে মাসে 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অদ্ভুতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। জনমঙ্গল সমিতির প্রতিটি কমিটি এই পত্রিকার পাঠক ও গ্রাহক হয়ে পড়েছিলেন। এটা এখন ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয় যে ত্রিপুরায় তখনও স্কুলের সংখ্যা ছিল নগন্য ; কোন কলেজ ছিলনা। জনসাধারনের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ও রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের আগ্রহ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। যে সব পাড়া, বস্তি বা বাজারে জনমঙ্গলের সভা ও সমর্থক ছিলেন তাদের কাছে পত্রিকাটি ছিল তাদেরই আশা আকাঙ্খার প্রতীক ও সংগ্রামের প্রেরনাদাতা। ১৯৪৭ সালের ১৭ই আগস্ট আগরতলায় এম, বি, বি, কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। এটাই ত্রিপুরার প্রথম কলেজ। আগরতলার মধ্যপাড়াতে রাজেন দে নামক একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের দোতলায় টিনের ঘরে সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির অফিস স্থাপিত হয়েছিল। এর পূর্বেও অমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরেন দত্তের বাড়ীতে নিয়মিত মার্কসীয় পাঠচক্র ও গোপন অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল। ঐ বাড়ীরই পুকুর পাড়ে একটি হস্তচালিত ছাপাখানা পরবর্তী সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। ঐ ছাপাখানাই কালক্রমে জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ প্রিন্টিং প্রেসে পরিণত হয়েছে। তখনও ত্রিপুরায় সারা রাজ্যে সংযোগকারী কোন সড়ক বা যানবাহন ছিলনা। রাজধানী আগরতলা থেকে ১২৬ মাইল পথ অতিক্রম করে আসাম সীমান্তে পৌছে ভারতের অন্য অংশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হত। ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জানতে হলে তখনকার ভৌগলিক পরিবেশ, দেশীয় রাজ্য শাসন ব্যবস্থা, উপজাতির প্রাধান্য, গণআন্দোলনের জন্ম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং জাতি-উপজাতি প্রশ্নের সঠিক সমাধানের প্রয়াস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। রিয়াং বিদ্রোহের সময় থেকেই ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বিশেষভাবে অবহিত হয়েছিলেন। রিয়াং বিদ্রোহ, জনমঙ্গল ও প্রজামণ্ডলের আন্দোলন এবং কমিউনিস্টদের প্রকাশ্যে কাজকর্মের পরিস্থিতি সৃষ্টির সময়কালে ছাত্র যুব আন্দোলনেরও উন্মেষ ঘটিয়েছিল। কমিউনিস্টরা এসময়ে উদ্বাস্তুদের সাথে আসা ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস প্রভৃতি মতাদর্শের রাজনৈতিক কাজকর্মের মোকাবেলা করতে আরম্ভ করেছিল। মূলত বলতে

গেলে কংগ্রেসের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে কোন ভিত্তিমূল তখনও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কারণ গণআন্দোলনের উদ্যোগটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। কমিউনিস্ট পার্টি কখনই কোন সংগঠনকে তার ঐতিহাসিক উদ্ভবের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেনা। তার ফলে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য বিভিন্ন মতাবলম্বী যুব-ছাত্র সমাজকেও একটি মঞ্চে দাঁড করবার প্রয়াস চালিয়েছিল। এসময়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী, ১৪৪ ধারা অমান্য করে একটি ছাত্র মিছিল বের হয়েছিল। এই মিছিলে প্রচণ্ড লাঠিচার্জ হয়েছিল। মিছিলে লাঠি চার্জের সম্ভবত এটি প্রথম ঘটনা। সরোজ চন্দ, আতিকুল ইসলাম, রবীন সেন প্রভৃতি কংগ্রেস, সোসালিটি ও কমিউনিস্টপার্টির যুব-ছাত্র নেতারা মিলিত ভাবে এই মিছিল বের করেছিল। বেশ কিছু ছাত্র ধৃত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই যুব-ছাত্র আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছাত্র-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছাত্র আন্দোলনেব অন্যতম নেতৃদ্বয়, দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য, ভুবনেশ্বর দে পরবর্তীকালে গণসংগঠনের মধ্যে পার্টিব হয়ে কাজের কৌশলকে কর্মচারী আন্দোলনে নিযে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তখন ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে প্রচণ্ড বিতণ্ডা চলছিল। পার্টিতে এ-ধাবনা নেতৃত্বেব বড অংশে এসেছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়—'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়।' কাজেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আপোষকামীদেব বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, তড়িৎগতি আক্রমনের দ্বারা প্রশাসনকে অচল করে দিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে হবে। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে আমি ও অঘোর দেববর্মা প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলাম। কলকাতা কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের মধ্যে এই ধারনাই প্রসার করেছিলাম যে কংগ্রেস নেতারা সহজে ত্রিপুরায় প্রজার ভোটে শাসন দেবেনা। এর জন্য আমাদের ব্যাপক গণআন্দোলন ও গণসংগ্রাম গডে তুলতে হবে। প্রজামণ্ডলের অভ্যন্তরে একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এটাকে পছন্দ করতো না। কারণ তাদের ধারনা ছিল প্রজামণ্ডল সম্পর্কে নেহরু সরকারের বিরূপ মনোভাব দেখা দিলে দায়িত্বশীল শাসন লাভের কাজ বিলম্বিত হবে। কাজেই কমিউনিস্টদের এই সংগঠন থেকে

বের করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল। কমিউনিস্ট পার্টি জনশিক্ষা সমিতির অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলের উপজাতি ও হিন্দু-মুসলিম কৃষকদের মধ্যে যে কমিটিগুলি গঠন করেছিল, কিছু সংখ্যক পার্টি কর্মী তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে সংগ্রামের পথে দায়িত্বশীল শাসন আদায়ের জন্য ব্যাপক জমায়েতের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটিকে 'দায়িত্বশীল শাসন' প্রতিভা দিবস হিসাবে পালন করেছিল। পার্টির ভিতরে তখন একটা বামপন্থী ঝোঁকও দেখা দিয়েছিল। বঙ্কীম চক্রবর্তী ও অঘোর দেববর্মা জনশিক্ষা ও প্রজামণ্ডলের বিকল্প হিসাবে স্বতন্ত্র কৃষকসভা গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের ভিতরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নরা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি সদস্যের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেই তারা সদর দক্ষিণের জন্মেজয় নগরে এক জনসভা আহ্বান করেছিল। ঐ সভাতেই টাকারজলার অখিল দেববর্মা, নারায়ন খামারের রাজেন্দ্র দেববর্মা, জিরানিয়ার কুঞ্জ দেববর্মা, কাঞ্চন মালার চন্দ্রশেখর দেববর্মা ও অন্যান্য প্রজামণ্ডল ও জনশিক্ষার কর্মীদের নিয়ে কৃষক সমিতি গঠন করেছিল। তখন দশরথ দেববর্মা ও সুধন্যা দেববর্মা এ কাজকে পছন্দ করেন নাই। তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে বন্ধুত্বসুলভ সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন যে কৃষক সমিতি গঠন হোক আর নাই হোক, মহাজনী শোষন ও দেওয়ানী শাসনের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা'তে যে ঘোষনা দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে তো আমরা কার্যকরী করছি। ২২-২-৪৮ সালে 'ত্রিপুরা রাজ্যের কথা' পত্রিকাটিকে ত্রিপুরা সরকার বে-আইনী ঘোষনা করছিল এবং সম্পাদক হিসাবে আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করেছিল। শুধু তাই নয় কমিউনিস্ট পার্টিকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের অগ্রনী নেতাদের সকলের বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যাপকভাবে জারী করেছিল এবং এরই প্রতিরোধে ত্রিপুরা উপজাতি মুক্তি পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এর পরবর্তী নাম হয়েছিল নাথ মুক্তি পরিষদ।

মূলত বলতে গেলে ১৯১৮ সালে ৯ই অক্টোবর ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টির আর একটি অগ্নিপরীক্ষার দিন এসেছিল। সামান্য সংখ্যক পার্টি সদস্য নিয়ে গোলাঘাটি হত্যালীলার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। গোলাঘাটিতে বিজয় নদীর পারে হরি সাহা নামক একজন দাদনদার প্রভূত ধান সংগ্রহ করে নিয়ে নৌকা বোঝাই করে বিশালগড়ের দিকে আসছিল। কমরেড অঘোরের নেতৃত্বে জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত গ্রামবাসীরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে

ধান বোঝাই নৌককে আটক করেছিল। হরি সাহা বিপাকে পড়ে ধান তাদের ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে শুধু একটা প্রস্তাব করেছিল, সরকার পক্ষের একজন লোককে সাক্ষী রেখে পরদিন এই ধান দেবে। সেদিনটি ছিল ৯ই অক্টোবর, ১৯৪৮ সাল। বুভুক্ষু জনসাধারন ধান নেবার জন্য টুকরি ইত্যাদি নিয়ে নৌকার পাশে ভোর বেলা থেকেই জড়ো হয়েছিল। সেদিন কিন্তু হরি সাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগন অজ্ঞ ছিলেন। ইতিমধ্যে বিশালগড থানার ও, সি, মিহির চৌধুরীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ সহ ধান বোঝাই নৌকা উদ্ধার করতে এগিয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কডা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রত্যেক থানায় যে নির্দেশ ছিল তাকেই কার্যকরী করার জন্য জনগণকে কোনরূপ সতর্ক না করে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুড়তে শুরু করেছিল। লাটিয়াছড়ার কুঞ্জ দেববর্মা, বডজলার সতীশ দেববর্মা ও অন্যান্য গ্রামের সাতজন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছিলেন। বিশজন আহতকে কোন প্রকার শুশ্রূসার ব্যবস্থা না করেই নদীতীরে ফেলে পুলিশ পুংগবেরা স্বচ্ছন্দে চলে এসেছিলেন। ইতিপূর্বেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও আক্রমনের আশঙ্কা করে বিভিন্ন জায়গার কর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাকে অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে কমিউনিস্ট সন্ত্রাস নামে শহরাঞ্চলে ও বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস প্রভাবিত লোকদের মধ্যে প্রচার করেছিল। সেই দিন থেকে জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টি আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের রনকৌশল নিয়ে এগুতে বাধ্য হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমর্থকদের নির্মূল করার এই অভিযান দিল্লী থেকে পরিকল্পিত ছিল। ১৯৪৮ সালের ৯ই অক্টোবর থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম কি রূপ নিয়েছিল এ সম্পর্কে আমি কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি :

"১৯৫০ সাল। শ্রদ্ধেয় বংশী ঠাকুর সঙ্গে। রাতের অন্ধকারে দুর্গাচৌধুরী পাড়া উপস্থিত হলাম। বড়দার বাড়ী। সেখান থেকে গামছা কবরা। সকালে আর একটু দূরে পার্টির 'গোপন' আস্তানায় গেলাম। কলকাতায় গোপন আস্তানায় দীর্ঘদিন থেকেছি। কিন্তু এখানে 'গোপন' কিছুই দেখলাম না। সবাই সবাইকে জানে, একজন শিশুও। আত্মরক্ষার তাগিদে ওরা সশস্ত্র। কমরেড দশরথ তখন বাইরে, ত্রিপুরার বাইরে পার্টির কাজে। বড়দা পরিচয় করিয়ে দিলেন এই যে মদন আমার ছোটভাই। কমরেড হেমন্তর গোপন নাম মদন। তার প্রথম কাজই হল আমাকে একটি নূতন নাম দেওয়া। সে নাম ছিল জগৎ। পরে শুনতে পেলাম কমরেড দশরথ লাম বা লামপ্রা নামে পরিচিত।

কংগ্রেসের আক্রমণ তখন হিংস্র, বিভৎস ও ব্যাপক। উপজাতি যুবকরা তখন প্রায় সকলেই ঘর বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায় তিন চার লক্ষ মানুষের এলাকায় তারা কংগ্রেস সরকারকে বে-আইনী ঘোষণা করে শান্তি ও গনতন্ত্রের এলাকা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। সে এলাকায় গণমুক্তি পরিষদ নিয়েছেন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সকল দায়িত্ব। রাজস্ব দপ্তর সেখানে অনুপস্থিত, ভূমিহীন জুমিয়াদের জমি বণ্টন করেন কমিটি, অনুপস্থিত বনদপ্তব। কেউ যায়না আদালতে, যায়না সরকারী অফিসে, যায়না থানা পুলিশের কাছে। শুধু উপজাতি নয়—হিন্দুস্থানী, বাঙালী নারী ও পুরুষ সকল অংশের মানুষ নিয়ে গঠিত গণমুক্তি পরিষদ এবং তার সশস্ত্র বাহিনী শান্তি সেনা। তাদের আইন শুধু শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা। মহাজনদের সুদের হার কি হবে, চাষের হালবলদের ভাড়া কি হবে, বাজারে ধানচালের আমদানি রপ্তানি কতটুকু হবে, কি দবে তা বিক্রি হবে তার জন্য তৈরী হয়েছে বিধি। সাময়িক ক্ষেত্রে মদ্যপান হয়েছে সীমিত, ছাত্রদের মধ্যে প্রায় নিষিদ্ধ। বিয়ের বয়স হয়েছে নির্দ্ধারিত। সম্পত্তির উপর নারী-পুরুষের সমান অধিকার হয়েছে ঘোষিত। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। তাব পবিচালনার জন্য গঠিত হয়েছে কমিটি, গঠিত হয়েছে তহবিল। প্রায় দুর্ভিক্ষে গরীবদেব বক্ষা করার জন্য গঠিত হয়েছে প্রত্যেক কমিটিতে ধর্মগোলা।

এক এলাকা থেকে অপর এলাকা, এক আস্তানা থেকে অপর আস্তানায় যাওয়া তখন সহজ ছিলনা। শহবে যাওয়া যাবেনা, বাজারেও নয়। বড বড রাস্তা তখন কম কিন্তু তাও এড়িয়ে যেতে হত। যেতে হবে শুধু আঁকা বাঁকা ছড়ায় ছড়ায়। সেখানে হাতি খেলা করে, বাঘেবা কৌতুক সৃষ্টি করে, বন্য কুক্কুট বা হরিণের সাথে সাক্ষাৎ হয় বটে তবে সব সময় গুলি করা সম্ভব ছিলনা, তার আওয়াজ চলে যেতে পারত শত্রুর কানে।……

এমনি একদিন এক গোপন আস্তানায় কমরেড মদন আমাকে নিয়ে গেলেন প্রকৃত জুমিয়ার ঘরে। বাঁশের ঘরে বাঁশের চুংগাতে রান্না, বাঁশের আগুনে আলো জেলে কলাপাতায় খাওয়া, বাঁশের চাটাই-এ সুন্দর একটা পাছড়ায় ঘুমানো। এই জীবন এক আবিষ্কার ছাড়া কি! কমরেড মদনকে জুমিয়া কমরেড ককবরকে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। পরে দা-মদন আমাকে বললেন এরা বলছেন, এই পাহাড়ী জীবনের মধ্যে কলকাতার মানুষ কি করে টিকে থাকে।

কমরেড মদন আমাকে হাতেখড়ি দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন উপজাতি জীবনের সাথে পরিচিত হতে। ('ইয়াপ্রী' ২৫শে জুন, ১৯৮১)

১৯৩৮ সালে জনমঙ্গল সমিতির জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে প্রজামণ্ডলের জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে গণমুক্তি পরিষদের জন্ম হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলি পিছিয়ে থাকা উপজাতি জনজীবনের অংশ হিসাবে ত্রিপুরার উপজাতি জনজীবনে এনে দিয়েছিল এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক সচেতনতা। সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটেছিল। কমরেড দশরথ দেবের ভাষায় বলতে হয়: "সর্বহারা শ্রেণীর চেতনার মান উন্নত করার জন্য কর্মীদেব মধ্যে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, কমিউনিজমের গোড়ার কথা, কমিউনিস্ট ইস্তাহার, পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নয়া গণতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দিয়ে মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠচক্র গড়ে তোলা হয়।" (জ্বালা, জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৮)

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি গনসংগ্রামেব প্রথম পর্যায়ে রিয়াং বিদ্রোহ ত্রিপুরার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলগুলিকে ধূমায়িত করেছিল। এবার গোলাঘাটিকে কেন্দ্র করে আগরতলা ও অন্যান্য ছোট শহরগুলি ছাড়া প্রায় সমগ্র সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই সংগ্রামকে পার্টি যতদূর সম্ভব নির্ভুল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল।

With a view to resist the severe Police and Military oppression Dasarath Deb Barma, Biren Dutta, Aghore Deb Barma, Bagala Deb Barma, Bhairab Deb Barma and other worker gathered at the village some Lefunga in sadar of division by the last week of July 1948 and formed Tripura Rajya Gana Mukti Parisad. Dasarath Deb Barma and Aghore Deb Barma were elected as President and General Secretary of the said parisad respectively. Later on Sudhanna Deb Barma, Hemanta Deb Barma, Later Rabindra Deb Barma, Hiran Deb Barma, Ramchandra Deb Barma. Chittya Deb Barma and Akhil Deb Barma were co-opted in its executive body.

Before the formation of the said Parisad, the people in hills generally craved for responsible Government in Tripura Henceforth the parisad faced the violence created by the Military and Police personal by violence and simulteniously shouted the slogans for Democratic right for the people of Tripura.

It is strange to note that this glorious struggle for self defence had not been appreciated by some Leaders of other political parties."

[Tripura in Transition, Tripur Ch. Sen. Page-74-75].

"পুলিশ এবং মিলিটারীর মারাত্মক নির্যাতন প্রতিবোধ ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে সদরের লেফুংগা গ্রামে দশরথ দেববর্মা, বীরেন দত্ত, অঘোর দেববর্মা, বগলা দেববর্মা, ভৈরব দেববর্মা এবং অন্যান্য কর্মীগণ মিলিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক পদে যথাক্রমে দশরথ দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে সুধন্যা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, মৃত রবীন্দ্র দেববর্মা, হীবন দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, অখিল দেবর্মাকে কার্যকরী কমিটিতে মনোনীত করা হয়েছিল। এই পরিষদ গঠনের পূর্বে পাহাড়ের জনগণ ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। এখন থেকে পুলিশ ও মিলিটারীর হিংস্র সন্ত্রাসকে পরিষদ মোকাবেলা করেছিল সশস্ত্রভাবে এবং ঐ সঙ্গে ত্রিপুরার জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্লোগান চিত্ত দেববর্মা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এটা আশ্চর্যজনক যে আত্মরক্ষার এই গৌরবজনক সংগ্রাম অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রশংসা পায়নি।" ('ঐ'—অনুবাদ)

প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরায় কংগ্রেসীরা এই গৌরবজনক গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বাঙালখেদা আন্দোলন হিসাবে প্রচার করেছিল। বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থাকে জনসমর্থিত করার উদ্দেশ্যে এরা এই বিকৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। আমি তখন জেলে ছিলাম।

কমিউনিস্ট পার্টি এম, বি, কলেজে ছাত্র সংগঠন তৈরী করেছিল। ঐ সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের নৃশংস অত্যাচার ও কংগ্রেসের গণতন্ত্রবিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রচার পত্র বিলি করেছিল। শহরে মিছিল বের করে

জনগনের চিন্তা চেতনাকে সঠিক পথে রাখার প্রয়াস চালিয়েছিল। ১৯৪৯ সালে আগস্ট মাসের পনের তারিখে এইরূপ প্রচারপত্র বিলি করার সময় অজিত দে, দিগ্বীজয় ভট্টাচার্য (প্রয়াত কর্মচারী নেতা), অপূর্ব রায়, মনোমোহন দেববর্মা, বাসুদেব ভট্টাচার্য, আতিকুল ইসলাম, সরোজ নন্দ, গৌরাঙ্গ দেববর্মা প্রভৃতি ছাত্রনেতারা জেলে বন্দী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা লাভের জন্য তারা সাতদিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। শহরে যে দুই তিনটি সাধারণ ছাপাখানা ছিল তাতেও খানাতল্লাশী করা হয়েছিল।

শহর ও গ্রামের এই দুর্জয় আন্দোলনগুলিকে বলা যায় রাজ্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গণভিত্তিমূলক ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গঠনের পটভূমি রচনা করেছিল।

প্রায় মুক্ত এলাকার মধ্যেই শহরের পার্টির ছাপাখানাটি গোপনে প্রেরণ করা হয়েছিল। এর সাহায্যে কমরেড দশরথ দেবের সম্পাদনায় 'বার্তা' পত্রিকা বেরিয়েছিল। । কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের সংবাদ অসংগঠিত অঞ্চল-সমূহে প্রেরণ করা হয়েছিল। পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের কার্যকরী নির্দেশসমূহ-এর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল।

পরবর্ত্তী সময়ে 'ত্রিপুরার কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। পার্টি বিভক্ত হওয়ার, পর সি-পি-আই-এর মুখপাত্র হিসাবে এটি এখনও চালু আছে।

আত্মরক্ষা সংগ্রামের এলাকা ও প্রতিরোধের স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। গোলাঘাটি ঘটনার পর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল বর্তমান আসাম আগরতলা সড়কের পূর্বাঞ্চলের গ্রামগুলিতে। রিয়াং বিদ্রোহ ছিল দক্ষিণ ত্রিপুরা ও আসাম আগরতলা সড়কের পূর্বাঞ্চলের পর্বতসংকুল অঞ্চল গুলিতে। এবার সরকারের আক্রমণের ফলে যে গ্রামগুলি দগ্ধ হয়েছিল সেগুলি রাজধানী আগরতলা থেকে দূরে ছিল না। অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চল। এখানে হালচাষীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এই চাষীদের মধ্যে হিন্দুস্থানী, বাঙালী, হিন্দু-মুসলমান ও উপজাতি কৃষকগণ ছিলেন। বস্তুতপক্ষে উপজাতি গ্রামগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

বিশালগড ও জিয়ানীয়া থানার বিস্তৃত এলাকাতে প্রথম অপারেশন শুরু হয়। রামনগর, সুতারমুড়া অঞ্চল থেকে জম্পুই এলাকা ধরে মিলিটারী বাহিনী ১৯৪৯ সালের মধ্যে যে গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে জিয়ানীয়া থানার

মাথামবাড়ী, দামতাবাড়ী, কবাইপাড়া, পুইঞা চান বাড়ী, বিশ্রামবাড়ী, সিপাই পাড়া, নরজনপাড়া এবং চেকাইপাড়া। টাকারজলার রামদুর্গাবাড়ীর সবগুলি বাড়ীই ভষ্মীভূত হয়েছিল। টাকারজলা, খনিয়ামারা, সিধাই প্রভৃতিতেও অবাধ লুটতরাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সদর ছাড়িয়ে খোয়াই-এর চাম্পাহাওর, কল্যানপুর, দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাটী, লুণ্ঠীত ও ভষ্মিভূত হয়েছিল। এরজন্য গ্রামবাসীর কোনই অপরাধ ছিলনা।

কংগ্রেসীদের কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞের বলি হয়েছিল পদ্মবিলের মধুতিদেবী, রূপশ্রীদেবী ও কুমারী দেবী। পদ্মবিলে হত্যাকাণ্ডের পর সংগঠিত হয় চাম্পাহাওর এলাকায় সামরিক অভিযান। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল পাড়ায় কম্বিং অপারেশন করে নেতাদের গ্রেপ্তার করা, জনগণের উপর দৈহিক নির্যাতন করা, লুণ্ঠন করা এবং এভাবে জনগণের সংগ্রামী মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া। এরই বিরুদ্ধে মুক্তি পরিষদ স্মরণ করেছিল গেরিলা রণকৌশল এবং সংগঠিত হয়েছিল গেরিলা ইউনিট।

"To resist the atrocities created by troops a strong volunteer crop was formed under the name of "Santi Bahini." It had the banner of "Gana Mukti Parisad" which was a red one with a star mark in the middle of it. This Bahini received whole hearted support of the people in general in hills. They challanged the Military forces with their ancestral matchlock guns. The Govt. of Tripura declared Military Administration over the entire Khowai Division in Tripura State Gazette dated the 9th March of 1949 corresponding to the 26th Falgoon of 1358 T, E, ; which order was again vacated by publication in a special issue of Tripura State Gazette dated 14th Feb, 1950,"

('Tripura in Transition', P-78)

"সৈন্যবাহিনীর নির্যাতনের প্রতিরোধে গড়ে উঠেছিল একদল শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে 'শান্তি সেনা বাহিনী'। এর পতাকা ছিল 'গনমুক্তি পরিষদেরই' লাল পতাকা যার মাঝে একটি তারকা চিহ্ন অঙ্কিত। পাহাড় অঞ্চলে জনগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল এই বাহিনীর প্রতি। এরা মান্ধাতা আমলের বন্দুক নিয়েই সৈন্য বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। ত্রিপুরা সরকার সমগ্র খোয়াই

বিভাগে ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ তারিখে ত্রিপুরা স্টেট গেজেট মূলে সামরিক শাসন জারী করেছিল। এই আদেশ ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ত্রিপুরা স্টেট গেজেট (বিশেষ সংখ্যা) মূলে প্রত্যাহৃত হয়েছিল। (ঐ—অনুবাদ)

এই আক্রমণের মুখে আন্দোলন কমলপুরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানেও সাংগঠনিকভাবে গণমুক্তি পরিষদ ও শান্তি সেনা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। অগ্নিগর্ভ ত্রিপুরায় জনগণ নিজেদের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হিসাবেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। রক্তপতাকার বুকে তারকা চিহ্ন গ্রহণ ছিল এরই লক্ষণ।

এ সম্পর্কে ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক লেখক ও কলাকুশলী সম্মেলনী কর্তৃক প্রকাশিত 'সংকলন' পুস্তিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় সঠিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে—"গোলাঘাটি হত্যাকাণ্ডের পর যেমন কংগ্রেস সরকারের চণ্ডনীতির তীব্রতা বেড়ে যায় তেমনি মুক্তি পরিষদের তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে পদ্মবিলের উপজাতি জনগণের সাথে সশস্ত্র মিলিটারী সংঘর্ষ হয়। উপজাতি নেতাদের বিশেষ করে দশরথ দেবদের ধরবার জন্য মিলিটারী গ্রামে গ্রামে হানা দিতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসীদের তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পীড়ন শুরু করে। একই বহুবৎসর ব্যাপী সামন্ততান্ত্রিক তিতুং দেবার জন্য উপজাতি রমনীদের পীড়ন করে। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উপজাতি নারী, পুরুষ মিলিটারী কর্তৃক নিগৃহীত হয় পদ্মবিলের খামার পাড়ায়, প্রতিরোধে এগিয়ে আসে গ্রামের সাধারন মানুষ।"

এই নৃশংস ঘটনার উপর ভিত্তি করে কলকাতার 'দি ন্যাশন' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর শিরোনাম ছিল 'Men hunting in jungle on Tripura.' এই অবস্থা আঁচ করেই ১৯৪৮ সালে মুক্তি পরিষদ গঠিত হয়েছিল এ সম্পর্কে কমরেড দশরথ দেব 'গণমুক্তি পরিষদের জন্মকথা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। গণমুক্তি পরিষদের ইস্তাহারটি ছাপাতে গিয়ে বীরেন দত্ত ধরা পড়ে যান, ইস্তাহারটি ছাপানোর ব্যবস্থা করে যান। সে সময় তিনি একটু বিব্রত বোধ করেছিলেন। তবে দায়িত্ব পালনের সংকল্প কমরেড দশরথের খুবই দৃঢ় ছিল। বস্তুতপক্ষে সেই সময় থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের আন্দোলনের ইতিহাস তাঁর কর্মশক্তির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আমি এ কথা এই জন্য বলছি যে, যদিও কমরেড অঘোর দেববর্মা পার্টিতে অনেক আগেই প্রবেশ করেছিলেন এবং কলিকাতা পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, তবুও তার চিন্তাধারায় অনেক ত্রুটি ছিল। আজ তিনি বলতে গেলে উপজাতি যুব সমিতি যা কিনা

পরোক্ষত সি-আই-এ পরিচালিত সংগঠন, তারই মতাবলম্বী। অথচ তিনি সি-পি-আই-এরও নেতৃস্থানীয় সদস্য রয়ে গেছেন। ত্রিপুরায় জুন, ১৯৭০ দাঙ্গার ওপর তার লেখা যারা পড়েছেন তারা আমার সঙ্গে এক মত হবেন। অতিবামপন্থী ঝোক যে শেষ পর্যন্ত অতিদক্ষিণপন্থী ঝোঁকে পরিণত হয় সেটা কমরেড অঘোরের জীবনে মূর্ত। গণমুক্তি পরিষদকে আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করার সময় না দিয়েই এককভাবে গোলাঘাটির মত ঘটনা সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। অথচ সদর দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলি যখন জ্বলছিল তখন কোনপ্রকার প্রতিরোধ গডে তোলার মত সংগঠন গডে তুলতে পারেন নি। বলতে গেলে সদর দক্ষিণে বিনা প্রতিরোধে পুলিশ ও মিলিটারী ধ্বংস লীলা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল অথচ খোয়াই-এ এসে কমরেড দশরথের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণপ্রতিরোধের মুখে মিলিটারীকে পডতে হয়েছিল। এই প্রতিরোধ প্রকৃতই গণপ্রতিরোধ। একে বামপন্থী চপলতা বা মুক্ত এলাকা গঠনের ধ্যান ধারনার সাথে মিলিয়ে দেখলে ভুল হবে। এই প্রতিরোধে জনগণই ছিলেন প্রধান শক্তি, অস্ত্রের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। তাই কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীর লেখাতে বর্ণিত গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব হয়েছিল।

আমি ১৯৪৮ সনে ধৃত হয়ে তেজপুর জেলে প্রেরিত হয়েছিলাম। মুক্তি পাওয়ার পুর্বেই পার্টিতে কমরেড রনদিভের তৎকালীন লাইন পরিত্যক্ত হয়েছিল। কমরেড রাজেশ্বর রাও-এর মুক্ত অঞ্চল গঠনের ধারনা দেখা দিয়েছিলেন। আমি তেজপুর জেলথেকে আন্দোলনের সাথে যতদূর সম্ভব যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। আমার স্ত্রী সরযু দত্ত তখন রামনগর সুতারমুড়া অঞ্চলে ছিলেন। তার সাথে দেখা করার অধিকার লাভ করার দাবীতে তেজপুর জেলে পনের দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই অধিকার ও মাসিক ত্রিশ টাকা হারে পারিবারিক ভাতা পেয়েছিলাম। তার কাছ থেকেই ত্রিপুরার কমরেডদের প্রেরিত সংবাদ সংগ্রহ কবতাম এবং তার মাধ্যমেই আমার সংবাদ প্রেরণ করতাম। জেল থেকে যেসব কথা শুনতাম তা এখন কমরেড দশরথের লেখা গণমুক্তি পরিষদের জন্মকথা থেকে উদ্ধৃত করছি :—

"১৯৪৮ সালে ৩০শে শ্রাবণ ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সে দিন ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ১৫ হাজার সুসংগঠিত জনতার এক বিশাল মিছিল দুর্গাচৌধুরী পাড়া থেকে রওয়ানা হয়ে আগরতলা শহর পরিক্রমা করেছিল। উমাকান্ত মাঠে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো জনসভা

করে ফিরে এসেছিল। সরকারের কোপানলে পতিত বস্তুত বে-আইনী সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত ত্রিপুরার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সসুংগঠিত মিছিল। এই মিছিলের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মিছিল তাদেরই দ্বারা সংগঠিত যাদের গ্রেপ্তার করতে কংগ্রেস সরকারের সামরিক বাহিনী পাগল। কুকুরের মতো উপজাতিদের পাড়ায় পাড়ায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই মিছিল ছিল তাদেরই মিছিল যারা মুক্তি পরিষদের আত্মগোপনকারী নেতাদের পুলিশের কাছে তুলে না দেবার অপরাধে, তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে সাহায্য না করার অপরাধে দিনের পর দিন পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত হচ্ছিল, মিছিলে আওয়াজ উঠেছিল ত্রিপুরায় প্রজার ভোটে সরকার চাই। ...দেওয়ানী শাসন দূর হোক, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল কর, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই, গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র হামলা বন্ধ কর, হামালা চালিয়ে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া চলবেনা উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক, সমাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ চলবে না।" এখানে বলা আবশ্যক যে তখন দশরথ দেব, সুধন্যা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল।

বীরেন দত্ত, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কান্তু সেনগুপ্ত প্রমুখ রাজনৈতিক কর্মীরা নিরাপত্তা আইনে জেলে আটক ছিলেন। প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুর ছাড়া আর সকলেই কমিউনিস্ট ছিলেন। মুক্তি পরিষদের কর্মীরা প্রায় একমাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এই মিছিল সংগঠিত করতে।

তখন ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যতায়াতের কোন যানবাহন ছিলনা। অধিকাংশ রাস্তাই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যেত। যে কয়টি সদর সড়ক ছিল সেগুলি এড়িয়েই মুক্তি পরিষদের কর্মীদের চলতে হতো। কাজেই পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে ছাড়া কর্মীদের সংগঠন পরিচালনা করার আর কোন সহজ পথ ছিলনা।

অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে এই অভিযানের প্রস্তুতি চালান হয়েছিল। কারা এই মিছিলে যোগদান করবেন তাদের তালিকা প্রস্তুত হতে থাকে।... এরূপ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সাংগঠনিক ভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। আমাদের সংগঠকদের বাইরের কাকপক্ষীও যাতে না জানতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যাতে শত্রুপক্ষ সরকার পক্ষ আমাদের মিছিলের কথা পূর্বাহ্ণেই জেনে সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে আমাদের মিছিলের আগরতলা শহরে প্রবেশের পথে গতিরোধ করতে না পাবে তার জন্যই এই সতর্কতা।...

মুক্তি পরিষদের আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব আপন অস্তিত্ব ও সংগঠনের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই যেখানে যেখানে মুক্তি পরিষদের সংগঠন গড়া হয়েছিল বা হচ্ছিল সে এলাকা বা পাড়ায় নরনারীদের কাছে আবালবৃদ্ধবনীত। মুক্তি পরিষদের কর্মীদের গতিবিধি ও যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। জনগণও এই গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।…মিছিলের আগের রাত্রে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় বিভিন্ন এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়।… আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মিছিল পরিচালনা। প্রস্তাব এল নেতাদের কারো মিছিলের সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাকে এবং কমরেড সুধন্যাকে কিছুতেই মিছিলে যেতে দেওয়া হবেনা। যুক্তি ছিল জোরালো। এক মিছিলই শেষ নয়। নেতারা যদি গ্রেপ্তার হয়ে যান তবে সংগঠনের দারুণ ক্ষতি হবে। বেশীর-ভাগ কর্মীর বিরোধীতা সত্ত্বেও এবং জনগণের এক অংশের নিম-রাজী ভাব সত্ত্বেও আমাদের বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। কমরেড অঘোর দেববর্মা এবং কমরেড হেমন্ত দেববর্মা উৎসাহের সাথে এই মিছিলের দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হয়েছিলেন।…১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই ত্রিপুরার পরিচিত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়। কমিউনিস্টদের সাথে যোগসাজস আছে এই অভিযোগে বা সন্দেহে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালানো হয়।…গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যেই উপজাতি পাড়া-গুলিতে সশস্ত্র পুলিশের হয়রানি তীব্রতর হতে থাকে। এমনকি বাজারে রাস্তায় উপজাতি ব্যক্তিদের দেখলেই পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এই বলে দশরথ, সুধন্যা, হেমন্ত, অঘোর কোথায়? তাদের ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে তোদের পাড়া ধ্বংস করে দেব। তা ছাড়া রাজার আমলের সম্মানিত উপজাতি সর্দারদের সাথে পুলিশ স্থানে স্থানে খুব দুর্ব্যবহার করে, আত্মগোপনকারীদের ধরিয়ে দেবার জন্য তাদের অপমানিত করে। জনশিক্ষা স্কুলগুলির উপর সরকারের পুলিশ, মিলিটারী হামলা চালায়। উপজাতিদের শিক্ষার পথে অচল ব্যবস্থা সৃষ্টির আশংকায় উপজাতি জনতা শংকিত হয়ে ওঠেন। রাজভক্ত উপজাতি সর্দারগণ রাজার মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের অবসান এবং দেওয়ানী শাসন প্রবর্তনে স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত, তার উপর এ ধরনের নগ্ন আক্রমণে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। মুক্তি পরিষদ এই বিক্ষোভসমূহ কাজে লাগায়। অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণ থেকেও এই রাজনৈতিক কারণগুলি উপজাতিদের আরো বেশী উত্তেজিত

ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই বস্তুটিকে ত্রিপুরার কমিউনিস্টরা সঠিক-ভাবে উপলব্ধি করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা চালিয়েছিল, যা উত্তর পূর্বাঞ্চল বা অন্য কোন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অনুপস্থিত—(লেখক) রাজতন্ত্রের প্রতি কোন মোহ সৃষ্টি না করে উপজাতিদের অনগ্রসরতার জন্য রাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ দায়ী করে এবং নূতন কংগ্রেস সরকারও সেই পথেরই পথিক অর্থাৎ কংগ্রেস সরকারও বিরাট সংখ্যক উপজাতিদের আরও চরম দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যাবে এই বক্তব্যসমূহ উপস্থিত করে বিক্ষুব্ধ উপজাতিদের প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত করার দিকে মুক্তি পরিষদ তৎপর হয়ে উঠে।" (জ্বালা, পঞ্চমবর্ষ ১ম ২য়া সংখ্যা)

এই মিছিলের পর কি ভাবে প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্ব শুরু হয় তাও লক্ষ্য করার মতো। উপজাতি পাড়াগুলিতে সশস্ত্র মিলিটারী টহল বৃদ্ধি পায়। ত্রিপুরার উপজাতিরা তীর ধনুক ব্যবহারে অভ্যস্থ ছিলেন না। তাঁরা বন্দুক ব্যবহারে অভ্যস্থ ছিলেন। সকল গ্রামে বন্দুকধারী ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিলনা। কাজেই গ্রামাঞ্চলে তীর ধনুক চালনায় অভ্যস্থ সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতির কাছ থেকে এটিকে শিখে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে পদ্মবিলে প্রথম সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ক্ষতি হয়েছিল। এর পরই সংঘর্ষ ঘটে চাম্পাহাওর-এ। এই সংঘর্ষ থেকেই গেরিলা কৌশলে লড়াই শুরু হয়। এ সম্পর্কে জ্বালা পত্রিকার এক প্রবন্ধে কমরেড দশরথ উল্লেখ করেছেন, তিনি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন,—আপনারা এই কৌশল পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করুণ। কম লোকক্ষয়ে সংগ্রামে জয়লাভ করতে হবে। বাড়ী ঘর পুড়ে গেলে পাওয়া যাবে, কিন্তু মানুষ মরে গেলে পাওয়া যাবে না। মূল লক্ষ্য হল সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করা। পরবর্তী সময়ে হিন্দুস্থানী তীরন্দাজ যুবক এই প্রতিরোধ ইউনিটগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। সমতল অঞ্চলের মুসলমান জনতার সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। (জ্বালা-ঐ)

এর মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে আবার বড রকম পরিবর্তন এসেছিল রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে পি, বি, গঠিত হয়েছিল। মুক্ত এলাকা গঠনের ধ্যান ধারনা পরিব্যপ্ত হয়েছিল। কমরেড বীরেশ মিশ্র ত্রিপুরার উপর একটি বিশেষ রিপোর্ট (অতিরঞ্জিত) পি, বি-তে পেশ করেছিলেন। আসাম প্রাদেশিক কমিটিতে তখন সম্পাদক ছিলেন প্রানেশ বিশ্বাস। তার সাথে আসাম জেলে আমার পরিচয় ঘটেছিল। অন্যদিকে সিলেট জেলা থেকে রঞ্জন রায় (প্রকৃত নাম হেমন্ত পুরকায়স্থ), মাখন দত্ত (প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্য দত্ত), রাখাল রাজকুমার

প্রভৃতি কমরেডরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিলেন। ত্রিপুরায় সংগ্রামী অংশগুলিকে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে এনে জেলা নেতৃত্বের মাধ্যমে মুক্তাঞ্চল গড়ার আয়োজন হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে বড়মুড়া পর্বতের একস্থানে পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্যদের একটি বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল। আমি যতদূর জেনেছি—এই বৈঠক হতে পারেনি। মিলিটারী অভিযানের জন্য কমরেড প্রানেশ বিশ্বাস তিনটি আলাদা আলাদা বৈঠক করেছিলেন এবং সেখানে পার্টির সভ্যপদ দেওয়া হয়েছিল। আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল। সম্পাদক হয়েছিলেন কমরেড রাখাল রাজকুমার। পুনরায় বলতে হয় গোলাঘাটি ঘটনার পর একটি রিলিফ ও চিকিৎসক দল প্রেরণ করার জন্য শ্রীহট্ট জেলে থেকে পার্টিকে লিখেছিলাম। পশু চিকিৎসক ডাক্তার রনজিৎ সেনের নেতৃত্বে একটি দল আগরতলায় এসেছিলেন। তাদের সাথে মার্কসবাদ সম্পর্কে শিক্ষিত একজন ডাক্তারও ছিলেন। শহরের কমরেডরা তার সাহায্যে অনেক ক্লাস করেছিলেন। যখন এই সব সশস্ত্র সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক চেতনা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে ৫০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। একজন উপজাতি কৃষক এই স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

গ্রামে সশস্ত্র আত্মরক্ষামূলক প্রতিবোধ, শহরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, রিলিফ কমিটি গঠন শান্তির সপক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান প্রভৃতি কাজকর্মের ফলে ত্রিপুরায় সশস্ত্র প্রতিরোধের সংগ্রাম তেলেঙ্গানা বা কাকদ্বীপের মত হতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে প্রশাসন সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রাজধানী আগরতলা ও ছোট ছোট শহরগুলির বাইরে একটা ব্যাপক অঞ্চলে ত্রিপুরা সরকারের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এ সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংসারী হালদার, ডাঃ বিজয় বসু, নৃপেন চক্রবর্তী, আসাম থেকে বিপুল চৌধুরী (মোহন চৌধুরী) এই রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

১৯৪৮ থেকে ৫০-এর শেষভাগ পর্যন্ত ইতিহাস কমরেড দশরথ ভালোভাবে লিখিতে পারেন। আমি আমার এই স্মৃতিনির্ভর লেখাটুকু পরিসমাপ্তির পূর্বে এটা বলতে চাই—শিলং জেলে বসে যখন কমিনফর্মে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উপর বিতর্কের ঝড় দেখতে পেয়েছিলাম—তখনই আমি স্থির নিশ্চয়তায় ছিলাম যে আমাদের স্বাধীনতা ঝুটাই হোক আর আসলই হোক আমাদের পার্টিকে নির্বাচন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে 'ত্রিপুরার

কথা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম এবং প্রথম সংখ্যায় একটা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা শাখা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। তখন ত্রিপুরা পার্টির মধ্যে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তাই এমন অপপ্রচারের মধ্যে পড়েছিলাম যে আমি নাকি শত্রুর চর হয়ে জেল থেকে বের হয়েছিলাম; ত্রিপুরার সেরা বিপ্লবীদের জেলে ধরিয়ে দেবার জন্য এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলাম। মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে। সংগ্রামী জনগণ ও পার্টির সাচ্চা কর্মীরা আমাকে এই অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শেষ-পর্যন্ত আমাকে পার্টির আপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে ভৎসনা করা হয়েছিল কেন আমি পার্টিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলাম—এটা শৃংখলা বিরোধী কাজ। পার্টি শৃংখলার দিক থেকে আমি তা মেনে নিয়েছিলাম, কিন্তু নির্বাচন সংগ্রামে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। অনেক সাধারণ ও নেতৃস্থানীয় কমরেড নির্বাচনে অংশ গ্রহণকে বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাওয়ার সামিল হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। প্রশ্ন অনেক ছিল। গেরিলা বাহিনীর কি হবে? আত্মগোপনকারী নেতাদের উপর যে মামলা ঝুলছে সে সমস্ত সমাধানের পথ কি? নির্যাতন ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তখনও চলছিলই। কিন্তু ত্রিপুরা পার্টিতে আমার মত যারা ভাবতেন—অথবা সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে আমি যাদের সাথে একমত হয়েছিলাম—তাদের মধ্যে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমেদ ছিলেন অন্যতম। তাঁরই পরামর্শে ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীতে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত পার্টিতে গৃহীত হয়েছিল। পার্টির নির্দেশে আমরা যারা জনমঙ্গল সমিতি, জনশিক্ষা সমিতি, প্রজামণ্ডল ও গণমুক্তি পরিষদে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন ও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি মনোভাবাপন্ন যেসব উদ্বাস্তুগণ ত্রিপুরায় রাজনীতি করতেন তাদের নিয়ে একটা সাধারণ মোর্চ্চা গঠন করেছিলাম।

জনকল্যাণ দল নিরপেক্ষ অর্ধ সাপ্তাহিক জীতেন্দ্র চন্দ্র পাল আগরতলা সাকিম্না প্রেস হইতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ঐ কাগজের ২য় বর্ষ ৪৮শে সংখ্যা ৫ই বুধবার ১৩৫৮ বাং ২২শে আগষ্ট ৫১ ইং-এর প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইন বড় হরফে দিয়া সংবাদ করেন তাহা হইল, 'দশ হাজার জনতার সমাবেশে দায়িত্বশীল শাসন দাবী' খোয়াই ১৬ই আগষ্ট অত্র অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় স্থানীয় জগত পেষ প্রাঙ্গনে শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১০ হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়। শান্তি, রিলিফ, খাদ্য ও দায়িত্বশীল শাসনের দাবীই ছিল

সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়। ত্রিপুরার অদ্বিতীয় জননেতা শ্রী বংশী ঠাকুর, ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী জীতেন্দ্র চন্দ্র পাল, আগরতলা বারের প্রসিদ্ধ উকীল ও দেশকর্মী শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্মা, ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী শ্রীধর বল্লভ সাহা ও কমিউনিস্ট কর্মী শ্রীসরোজ চন্দ্র ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল শাসনের দাবীতে বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের পক্ষে একজন যুবতী মুক্তি পরিষদের ইতিবৃত্তি ও দাবী-দাওয়া সম্পর্কে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। স্থানাভাবে বিস্তৃত সংবাদ দেওয়া গেল না। ঐ কাগজেরই ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠার সংবাদও তুলিয়া ধরিতেছি। "দায়িত্বশীল শাসন দাবী দিবস" হিসাবে ১৫ই আগষ্ট প্রতিপালিত। আগরতলা, ১৫ই আগষ্ট অদ্য ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘ্য ও ত্রিপুরা ষ্টেট কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগীতায় দলীয় ও অদলীয় প্রায় ১৯টি প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল শাসন দাবী দিবস পালন করে। এতদুপলক্ষে অপরাহ্নে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ অনুপস্থিত থাকায় গণতান্ত্রিক সংঘের সহ-সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্র দেববর্মা সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রবল জনমত উপেক্ষা করিয়া চীফ্ কমিশনারী শাসন বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনতন্ত্র বিরোধী অগণতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র সমালোচনাপূর্বক অবিলম্বে স্বায়ত্ব শাসনের দাবীর উপর সভায় সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এডভোকেট শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ (সভাপতি, গণতান্ত্রিক সংঘ) বলেন দেশের স্বাধীনতা যদিও আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দেশবাসীর জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নাই। প্রকৃত স্বাধীনতা পাইতে হইলে আরও ত্যাগ স্বীকার করতে হইবে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সংগ্রাম এখনও যে শেষ হয় নাই, প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাহা উল্লেখ করেন। এডভোকেট শ্রীঅনিল চক্রবর্তী (কংগ্রেস) কর্তৃক উত্থাপিত দায়িত্বশীল শাসনের দাবীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

TRIPURA RAJYA GANATANTRIC SANGHA

(T. R. G. S.)

During 1949 to 1950, the administration of Tripura was practically limited to its Sub-divisional towns only. Mr. K. K. Hazara came in Tripura as its Chief Commissioner on August of 1950 and offered peace-proposal to all politically conscious groups including the aggrieved organisations. The

fact led some educated leaders of all groups to form this organisation. The leaders used to seat together once in a week on every Sunday at its office at Krisnanagar, Agartala. The object of the Sangha was to provide a common platform for all classes of workers with democratic ideas and popularisic democratic ideas and thoughts among the people

Among the active members were late Pravat Ray, Bangsi Thakur, Birchandra Deb Barma, Chitta Chandra Sukhamay Sen Gupta, Bankim Sen Gupta, Birballav Saha, Ershad Ali Chowdhury, Kanti Deb Barma, Biren Dutta, Sushil Barman, Gopi Laskar, Jiten Paul and Nibaran Chandra Ghosh.

(Tripura in Transition Pag 66 67)

ত্রিপুরা রাজ্য গণতান্ত্রিক সংঘ

১৯৪৯-৫০ সালে ত্রিপুরার প্রশাসন মহকুমার শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫০ সালের আগস্টে চিফ্ কমিশনার হিসেবে কে, কে, হাজরা ত্রিপুরা আসেন। বিভিন্ন রাজনীতি সচেতন গ্রুপ এবং ব্যক্তিবর্গকে তিনি বিক্ষুব্ধ সংগঠনগুলি সহ শান্তির প্রস্তাব দিলেন। সংঘের নেতৃবর্গ প্রতি রবিবার দিন কৃষ্ণনগরস্থ অফিসে আলোচনায় বসতেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শ্রেণীর গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কর্মীদের একটি যুক্ত মোর্চায় একত্রিত করা এবং জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তা ও আদর্শের ব্যাপ্তি ঘটানো।

এই সংঘের সক্রিয় সদস্যদের মধ্য ছিলেন প্রয়াত প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা, চিত্ত চন্দ, সুখময় সেনগুপ্ত, বঙ্কিম সেনগুপ্ত, বীরবল্লভ সাহা, এরসাদ আলি চৌধুরী, কান্তি দেববর্মা, বীরেন দত্ত, সুশীল বর্মন, গোপি লস্কর জীতেন পাল এবং নিবারণ চন্দ্র ঘোষ। (অনুবাদ)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতা কমরেড দশরথ দেব সংঘর্ষে খুব কম লোককে মরতে দিয়েছিলেন। শত্রু হিসাবেও খতম হয়েছিল খুব কম সংখ্যক। ত্রিপুরায় প্রকৃতই বড় ধরণের হটকারী আন্দোলন হয় নি। কিন্তু তৎকালীন বুর্জোয়াদের অপপ্রচার ছিল অনেক বেশী। তারা এটাই আশা করেছিল যে অপবাদ দিয়ে কমিউনিস্টদের খতম করার কাজ হাসিল করা যাবে। প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসকে এতটুকু ম্লান না করেও আজ বলতে পারা

যায় ত্রিপুরার জনগণের প্রতিরোধেই ছিল প্রধান শক্তি। বন্দুকের নলে বিপ্লবের জন্ম—এ ধারণা ছিল না। তবুও সরকারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্রায় তিন বৎসর কাল একটা ব্যাপক এলাকায় জনগণ স্বশাসনে ছিলেন। গঠনমূলক কাজে যে বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে এটা তার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। রাজতন্ত্রের অবসান, উপজাতি জনগনের শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তির কামনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার, স্থানীয় পার্টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সহায়তা, সব কিছুকে মিলিয়েই প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়া বিনা ক্ষয়ক্ষতিতে ত্রিপুরার জনগন কিছুটা ব্যাক্তিস্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রী কে, কে, হাজরাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চিফ্ কমিশনার করে পাঠানো হয়েছিল। তিনি একজন জজ ছিলেন। এই কারণেই ত্রিপুরার অশান্ত অবস্থা প্রশমনে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য তাঁর ভূমিকাও মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে দিল্লী থেকে বি. এন, মল্লিক নামে ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রধান ত্রিপুরায় এসেছিলেন। চিফ্ কমিশনার হাজরা সব সংগঠনের নেতাদের তার সাথে সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পার্টির পক্ষ থেকে আমাকে আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। আমার বেশ মনে আছে সাক্ষাৎকারের সময় তার প্রথম প্রশ্ন ছিল দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে এটা মনে করি কিনা? আমি বলেছিলাম, না, এটা পূর্ণ নয়, এটা ধনিক শ্রেণীর স্বাধীনতা মাত্র। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এটাই কি পার্টির সকলের ধারণা? জবাবে আমি বলেছিলাম, সে আমি বলতে পারবনা --তবে এটা বলতে পারি সকলেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তারজন্য আবহাওয়া নেহরু সরকারকে তৈরী করতে হবে; সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে; গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নিতে হবে; অবাধে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে।

শ্রীমল্লিক বারবার বলতে থাকেন, আপনারা বে-আইনী অস্ত্রগুলো ফেরত দিন। জবাবে বলেছিলেন আমাদের কোন সশস্ত্র সংগঠন নেই। গ্রামের মানুষের উপর আক্রমণ ঘটলে মানুষ হাতের কাছে যে অস্ত্র পায় সে অস্ত্র দিয়েই প্রতিরোধ করে। এগুলি তাদেরই সম্পত্তি।

পরিশেষে আসাম রাইফেল্স থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কিছু অস্ত্রের কথা বলে তিনি বলেছেন 'টোকেন' হিসাবে এগুলি ফিরিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাস অর্জন করুন। আমি জবাবে বলেছিলাম, "কমিউনিস্ট পার্টি অবাধ নির্বাচন

চায়, ত্রিপুরার বিভিন্ন দলমতের লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। এর মধ্যে কোন সর্তের অবকাশ নেই। যদি নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় তবে আমাদের পার্টিকে কেউ আটকাতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকারেরই বরং নিরাপরাধ নরনারীকে হত্যা করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। রাজনৈতিকভাবে বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কোন কথাই আসে না। আমরা কংগ্রেসের বিরেধী দল হিসাবে নির্বাচনে সংগ্রাম করব" শেষ পর্যন্ত আধা আইনী আধা বে-আইনী অবস্থায় আমবা নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছিলাম। লাভের মধ্যে যে জিনিটি ঘটেছিল সেটা হল ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে খোয়াই বিভাগে সামরিক শাসনের ঘোষণা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। জনগণেব মধ্যে প্রকাশ্য সমাবেশে যোগদানেব আগ্রহ বেড়েছিল। গণতান্ত্রিক সংঘের নেতৃবর্গকেও এই সমাবেশে নিযে যাওয়া হযেছিল। পলাতক নেতাবা সংগঠিত গ্রামাঞ্চলেব প্রকাশ্য সমাবেশগুলিতে গণতান্ত্রিক সংঘের নেতৃবর্গের সাথে বক্তব্য বাখতে সুযোগ পেয়েছিলেন। এ-সময সরকারী কর্মীদের মুখপত্র 'আমাদের কথা' এবং কমিউনিস্ট পার্টিব মুখপত্র 'ত্রিপুবাব' কথা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতান্ত্রিক সংঘ যুক্তভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল। এই তালিকায ছিলেন লোকসভায় পূর্ব ত্রিপুবাব কমিউনিস্ট প্রার্থী দশবথ দেব এবং পশ্চিম ত্রিপুবার বীরেন দত্ত। কংগ্রেস প্রার্থীরা ছিলেন যথাক্রমে শচীন্দ্র লাল সিংহ ও সুকুমার চক্রবর্তী। এই নির্বাচনে প্রচার কাযের জন্য কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ, কমরেড জ্যোতিবসু, কমরেড মনিকুন্তলা সেন প্রভৃতি নির্বাচন সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন।

নির্বাচনী পরিষদের ত্রিশটি আসনেব মধ্যে ।ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রমোদ দাশগুপ্ত, হেমন্ত দেববর্মা, আতিকুল ইসলাম, সুধন্যা দেববর্মা, সিরাজুল ইসলাম, আপ্তাবুদ্দীন, অঘোর দেববর্মা, সতীশ চক্রবর্তী, কিরন মালা দেবী, পার্টি সমর্থিত নির্দল ছিলেন এরসাদ আলি, বংশী ঠাকুর, গন সি, গণতান্ত্রিক সংঘের প্রার্থী বীরচন্দ্র দেববর্মা, ডাঃ নন্দলাল চক্রবর্তী, মনীন্দ্র কিশোর চৌধুরী। লোকসভার দুটি আসনে এবং রাজ্যসভার একটি আসনে কমিউনিস্ট প্রার্থী ও কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। বিজয় অর্জন করাব পথে শেষ অঘাত এনেছিল আগরতলা চিলড্রেন পার্কে জণজমায়েতের পর। এতবড় জমায়েত আজকালও খুব কমই হয়। নির্বাচন প্রার্থী অনেকের উপর হুলিয়া জারী ছিল।

আমরা যারা প্রকাশ্যে কাজ করতাম তাদের হঠাৎ আইন করে জেলে রাখা হয়েছিল। বন্দীদের মধ্যে আমি লোকসভা প্রার্থী, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর প্রমোদ দাশগুপ্ত আতিকুল ইসলাম প্রমুখ নির্বাচনী পরিষদ-প্রার্থী এবং বহু সক্রিয় কর্মীরা ছিলেন। এই সময়ে কমরেড ডাঃ বিজয় বসুই চীনামেডিকেল মিশনের অন্যতম সদস্য আগরতলার কামান চৌমুহনীস্থ প্রকাশ্য পার্টি অফিসে বসে নির্বাচনী সংগ্রামের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। কমরেড দশরথ দেব এবং কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃবর্গ আত্মগোপন অবস্থায় থেকেই নির্বাচনে বিজয়কে অবধারিত করেছিলেন। আইনী ও বে-আইনী কাজকে একসাথে পরিচালনার কৌশল যতদূর সম্ভব সঠিক ভাবেই ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টি প্রয়োগ করেছিল। আজ হয়ত অনেকে ভাবতেই পারবেন না কমরেড দশরথের মনোনয়ন পত্রের স্বাক্ষর প্রত্যায়িত হয়েছিল কলকাতার আলিপুর কোর্টে। নির্বাচনের পরেও কমরেড দশরথকে লোকসভায় নিয়ে যাওয়া হবে কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক ছিল। কমরেড ডাঙ্গের উপস্থিতিতে গামছা করবার গোপন ঘাটিতে মিটিংয়ে কমরেড দশরথের লোকসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে দিল্লী পর্যন্ত কমরেড দশরথকে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখানে ডঃ মহাদেব চক্রবর্তীর লেখা প্রবন্ধ 'হে অতীত কথা কও' থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—১৯৫১ সনের শেষ দিকে মুজাফফ্‌র আহমদ, জ্যোতি বসু, এম. এ. ডাঙ্গে দরবার মাঠে (বর্তমান শিশু উদ্যান) কর্তৃপক্ষের অনুমতি খারিজ হওয়ায় সভা করতে পারলেন না। দশরথ দেব, হেমন্ত দেববর্মা, সুধন্যা দেব র্মা প্রভৃতি নেতৃবর্গের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে প্রতাপগড এলাকায় ধান ক্ষেতে জনসভার আয়োজন করা হল। ২রা ডিসেম্বর এই বিশাল ধান ক্ষেত মিছিলে মিছিলে ভরে গিয়েছিল। লাল টুপী পরিহিত প্রায় দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছিল মিছিলের সাথে। এই সমাবেশ অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উপজাতি, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান কৃষকের গণজমায়েত। হাজার অপপ্রচার সত্বেও ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। যে মানুষটির মাথার দাম ঘোষনা করা হয়েছিল কয়েক হাজার টাকা সেই আত্মগোপনকারী দশরথ দেব জনতার রায়ে নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় উপস্থিত হবার সাথে সাথে ইতিহাসে এক নয়া নজীর সৃষ্টি হয়েছিল। ছোট ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের সাফল্যের এটি ছিল চরম মুহূর্ত।" (স্মরনিকা পৃঃ ৬০)।

এখন আমার যতটুকু মনে পড়ছে—এই উৎসবে কমরেড অজয় ঘোষ এবং হীরেন মুখার্জীও উপস্থিত ছিলেন। এই জমায়েতে মূল আওয়াজ ছিল নির্বাচনী পরিষদকে বিধান সভায় পরিনত কর ; বিজয়ী পরিষদ সদস্যদের হাতে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তুলে দাও। বংশী ঠাকুর একটি গান গেয়েছিলেন তার প্রথম লাইনটি ছিল 'নির্বাচনে জয়ী যারা তারাই করবে দেশের শাসন।' নির্বাচনী পরিষদে ৩০টি আসনে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিলেন ২১টি আসন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপাত্র 'লাস্টিং পিস' পত্রিকাটিতেও এই সাফল্যের সপ্রশংস সমালোচনা বেরিয়েছিল। ডাক্তার মেঘনাথ সাহা-এম, পি, কমরেড দশরথ দেবকে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ; তার উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছিলেন। আত্মগোপন অবস্থায় দশরথ দেব লোকসভায় উপস্থিত হওয়াতে সেদিন লোকসভায় প্রচণ্ড কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত প্রথম লোকসভার অধিবেশনের দিনগুলিতে দেশ বিদেশের প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকার বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। কমরেড দশরথ দেব লোকসভার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার সময় শত শত ফটো ফ্লাসের দৃশ্যগুলি আজও আমার স্মৃতিপটে জাগরুক আছে। সেদিনই হয়তো ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের শেষ ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার মানচিত্রটি বিশ্বের প্রগতিশীল জনগনের মধ্যে প্রথম পরিচিতি লাভ করেছিল ও তার সংগ্রামী জনগণ এবং সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল।